বিজ্ঞানের বিচিত্র জগৎ

তৃতীয় ভাগ

The Wonderworld of Science এর বাংলা রূপান্তর)

রচয়িতা
ওয়ারেন নক্স মরিস মিইষ্টার
জর্জ স্টোন ডরিস নোবল

বাংলা রূপান্তর
সুবোধ সেনগুপ্ত

চিত্রাঙ্কন
থিয়োডোর মিলার

তৃতীয় ভাগ

রাজকমল প্রকাশন (প্রাইভেট) লিমিটেড
দিল্লী—পাটনা

This book is offered at a reduced price through the subsidy granted by the Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs, Government of India, under their scheme for the popularization of Science.

মূল্য : ৩:৫০
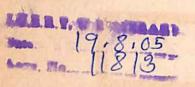
বাংলা অনুবাদ, ১৯৬২
রাজকমল প্রকাশন (প্রাইভেট) লিমিটেড

মুদ্রক : নবীন প্রেস, দিল্লী
প্রকাশক : রাজকমল প্রকাশন (প্রাইভেট) লিমিটেড, দিল্লী

সূচীপত্র

খাবার-নির্মাতা

পৃথিবীর পরিবর্তন

তাপ

কাজ সহজ করা

পৃথিবীর গতি

উদ্ভিদ কী করে জন্মায়

উপকারী উদ্ভিদ

2281

যারা খাবার তৈরী করে

খামারে গ্রীষ্মকাল

পুরো গ্রীষ্মকালটাই যতীন তার মামাদের খামারবাড়ীতে ছিলো। এখন সে বাড়ী ফিরে এসেছে।

"কাল যে স্কুল খুলবে তা মনে আছে তো ?" যতীনের মা বলেন। "স্কুলে যাবার জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে নাও। কাল সকালেইতো দরকার পড়বে ওগুলোর।"

যতীন জামাকাপড়গুলো গুছিয়ে নেবার জন্য নিজের ঘরে যায়।

"এগুলো একবার পরে' দেখলে মন্দ হয়না," যতীন মনে মনে ভাবে। "তা হলেই বোঝা যাবে এগুলো ঠিক আছে কিনা।"

যতীন বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকে, আর ওর মা ভাবতে থাকেন ও কী করছে। অবশেষে যতীন ডেকে বলে: "মা!"

"কী ব্যাপার?"

"এগুলো কি আমার জামাকাপড়?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়," ওর মা বলেন।

"এগুলো যে যথেষ্ট বড়ো নয়। আমি এগুলো পরতে পারছিনা।"

গোলযোগটা কী নিয়ে তা দেখবার জন্য যতীনের মা ওর ঘরে যান। খাঁটো আর আঁট হয়ে যাওয়া জামাকাপড় পরা অবস্থায় যতীনকে দেখে তিনি হেসে ফেলেন। এর পর যতীনকে নিয়ে দোকানে গিয়ে নতুন জামাকাপড় কিনে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

পরের দিন সকালবেলা যতীন যখন স্কুলে যায় তখন বীরু ওকে বলে: "আমিতো তোকে প্রথমে চিনতেই পারিনি; তুই এতো ঢ্যাঙ্গা হ'য়ে গেছিস!"

ছেলেরা একটা রুলার দিয়ে যতীনকে মেপে দেখলো যে সে গ্রীষ্মের ছুটীর মধ্যেই লম্বায় পুরা তিন ইঞ্চি বেড়ে গেছে। তাকে তুলাযন্ত্রে ওজন করে দেখা গেলো যে তার ওজনও বসন্তকালের চেয়ে তিন পাউণ্ড বেড়ে গেছে।

যতীনের সহপাঠিনী মণিকা ওকে জিজ্ঞাসা করেঃ "এক গ্রীষ্মের ছুটীতেই তুমি এতোখানি তাড়াতাড়ি বাড়লে কী করে?"

"গ্রীষ্মকালটা খামারবাড়ীতে ছিলাম বলেই এভাবে বাড়তে পেরেছি," যতীন বলে। "সেখানে প্রায় সব সময়ই ঘরের বাইরে কাজ করতাম আর প্রচুর ভালো ভালো খাবার খেতাম কিনা তাই।"

"খামারবাড়ীতে তুই কি কাজ করতিস্?" পরেশ জিজ্ঞাসা করে।

"সেখানে আমি প্রায়ই লোকজনদের ক্ষেতের কাজে সাহায্য করতাম," যতীন বলে। "সেখানে আমি বলদের গাড়ী চালাতে শিখেছিলাম, গরুর দুধ দুইতেও শিখেছিলাম। আর রোজই হাঁস-মুরগীর ডিম সংগ্রহ করতাম।"

"কী খেতিস সেখানে?" বীরু জিজ্ঞাসা করে।

"যতো খুসী দুধ খেতাম," যতীন বলে। "রোজ সকালে ডিম খেতাম। তাজা সব্জি আর ফলও অঢেল পাওয়া যেতো।"

"ও:, তাই তুমি এতো তাড়াতাড়ি এতোখানি বাড়তে পেরেছো," মণিকা বলে।

ছেলেমেয়েরা যতীনকে আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সে ওদেরকে খামারের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা বলে।

"খামারের এতো যেসব জিনিষ জন্মায় সেগুলো দিয়ে তোর মামা কী করেন?" দীপক জিজ্ঞাসা করে।

"বেশীর ভাগ জিনিষই তিনি বিক্রী করে দেন," যতীন বলে। "সেগুলো তিনি রেলগাড়ী, লরী ও গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে সহরে পাঠিয়ে দেন।"

"এমনও হতে পারে যে এবার গ্রীষ্মকালে তোমার মামার দুধ আর ডিম আমিও খেয়েছি," মণিকা বলে। "টাটকা দুধ আর ডিম আমি খুব পছন্দ করি।"

খাবার কোথা থেকে আসে

"আমাদের সব খাবারই কি খামার থেকে আসে?" পরেশ জিজ্ঞাসা করে।

"আমার মনে হয় বেশীর ভাগই আসে," যতীন বলে। "তা ছাড়া আর কোথা থেকে আসবে?"

"তোর মামার খামারে কি মাছও পাওয়া যায়? বীরু জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ," যতীন বলে। "আমি সেখানে ঝর্ণার জলে মাছ ধরতাম। অবশ্য সে মাছগুলো আমি সহরে পাঠাতাম না, নিজেই খেতাম।"

"আচ্ছা, মাছ না হয় তোর মামার খামারের ঝর্ণা থেকে আসে," বীরু বলে, "কিন্তু আপেল তো আসেনা। সেগুলো তো পাহাড় থেকে আসে।"
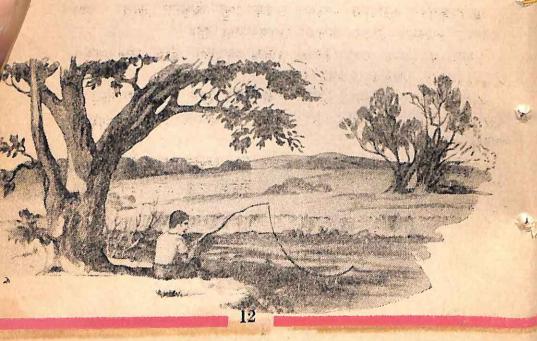
তখন ছেলেমেয়েরা এমন অনেক খাবারের কথা ভাবে যেগুলো খামার থেকে আসেনা। ওরা কতগুলো খাবারের জিনিষের কথা ভাবে যেগুলো অনেক দূরের দেশ গুলো থেকে আসে। ওরা কতগুলো জলচর জীবের নাম করে যেগুলো মানুষের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ওরা অনেকরকম গাছগাছড়া ও যেগুলো থেকে আমাদের খাবার পাওয়া যায় সেগুলোর ছবি বের করে' দেখে।

''এভাবে খাবার জিনিষ সম্বন্ধে আরও জানতে চেষ্টা করলে বেশ মজা হবে,'' তনুকা বলে। ''আমার ইচ্ছা হয় সবরকম খাবারের কোনটা কোথা থেকে আসে তা জানতে।''

''আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,'' মণিকা বলে। এসো আমরা প্রত্যেকে নানারকম খাবারের একটা তালিকা তৈরী করে' সেগুলো সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করি। তারপর সবাই একসঙ্গে তালিকাগুলো মিলিয়ে খাবার জিনিষ সম্বন্ধে আরও জানতে পারবো।''

কথাটা ওদের সবারই খুব ভালো লাগলো, এবং সেই অনুসারে ওরা খুব খাটতে লাগলো। ওরা অনেক বইপত্র ঘাঁটলো, অনেক ছবি দেখলো, নানালোককে নানারকম প্রশ্ন করলো। তারপর প্রত্যেকে যে যার গল্প বলবার জন্য তৈরী হ'লো।

প্রথম গল্পটা বললো পরেশ। এই হ'লো তার গল্পটা ঃ

চীনাবাদাম

আমি যে উদ্ভিদটা সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছি সেটা হ'লো চীনাবাদামের চারা।

চীনাবাদাম আসলে বাদাম নয়। আসলে ওগুলো সীম।

অন্যান্য শীমজাতীয় উদ্ভিদের মতো চীনাবাদামের চারাও মাটিতেই রোপণ করা হয়। চারাগুলো যথেষ্ট বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোতে মুকুল হয়। তারপর প্রত্যেকটি মুকুল একএকটি ছোট চীনাবাদাম হয়ে যায়।

এর পরেই একটা মজার জিনিষ ঘটে: ছোট ছোট চীনাবাদাম শুদ্ধু চারাটা হেলে পড়ে, আর তখন ছোট ছোট চীনাবাদামগুলো মাটির নীচে বাড়তে থাকে।

সারা গ্রীষ্মকাল ধরে চীনাবাদামগুলো মাটির নীচে বাড়তে থাকে। কখনো কখনো একটা চারা থেকে শতশত চীনাবাদাম জন্মায়। শরৎ কালে চীনাবাদামের চারাগুলোকে উপড়ে' তুলে' ফেলা হয়, আর চীনাবাদামগুলোকে আলাদা করে' নেওয়া হয়।

চীনাবাদামগুলোকে একটু ভেজে নিলে সেগুলো খেতে খুব ভালো লাগে।

এর পরের গল্পটা বললো মণিকা :

চকোলেট

আমি যে উদ্ভিদটার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা শুধু উষ্ণ দেশগুলিতেই জন্মায়। এর নাম হ'লো 'কাকাও' গাছ।

'কাকাও' গাছে সারা বছরই সবুজ পাতা থাকে। বছরে দু'বার করে' এই গাছে একরকম হলুদ রঙের ফুল হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই ফুলগুলো হলুদ রঙের বড়ো বড়ো খোসার আকার ধারণ করে আর প্রত্যেকটি খোসার মধ্যে পাঁচ সার 'কাকাও' দানা থাকে।

প্রথমে খোসাগুলোকে গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া হয়। তারপর সেগুলোকে স্তূপ করে' সাজিয়ে পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পরে খোসা ছাড়িয়ে দানাগুলোকে শুকিয়ে ভেঁজে নেওয়া হয়।

এই ভাঁজা দানাগুলো পিষে যে গুড়ো তৈরী হয় তা দিয়েই আমাদের খাবার চকোলেট হয়। সেই গুড়ো গরম জলে দিয়ে চা কিংবা কফির মতো তরল চকোলেটও তৈরী করা যায়।

বীরু বলে এর পরের গল্পটা :

কলা

কলাও উষ্ণপ্রধান দেশেই জন্মায়। সেখানে লোকেরা প্রথমে জমিটা ভালো করে' খুড়ে নেয়, তারপর ছোটছোট কলাগাছের চারা লাগিয়ে দেয়।

কলাগাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কোন কোন যায়গায় সেগুলো এক এক দিনে প্রায় দু'ফুট বাড়ে।

কলাগাছটা যখন দশ-বারো ফুট উচু হয় তখন সেটার উপর থেকে একটা মঞ্জরী বের হয় যাকে বলে 'মোচা'। মোচাটা ছোটছোট সবুজ কলায় ভর্ত্তি থাকে।

ছোটছোট কলাভর্তি কাঁদিটা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, তারপর যখন খুব ভারী হয়ে যায় তখন সেটা গাছের একপাশে ঝুলে পড়ে। কলাগুলো পাকতে শুরু করার আগেই লোকেরা কাঁদিটা গাছ থেকে কেটে নামিয়ে নেয়।

এক একটি কলাগাছে শুধু একটি করে কলার কাঁদি হয়। কলার কাঁদিটা গাছ থেকে কেটে নেবার পর কলাগাছটাকেও কেটে ফেলা হয়। তখন সেটার শিকড় থেকে নতুন কলার চারা জন্মায়।

উদ্ভিদরা হাওয়া নেয়

"আমার একটা প্রশ্ন আছে," মণিকা একদিন বলে। "আমি প্রশ্ন-টার উত্তর বের করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু মনে হয় কেউ তা জানেনা।"

"তোমার প্রশ্নটা কী?" পরেশ জিজ্ঞাসা করে। "আমি জানতে চাই উদ্ভিদরা কী করে তাদের খাবার সংগ্রহ করে," মণিকা বলে। "আমরা তো উদ্ভিদ থেকে নানান রকমের খাবার পাই, কিন্তু উদ্ভিদরা তাদের খাবার পায় কোথা থেকে?"

মণিকার প্রশ্নের উত্তর ওদের কারোরই জানা ছিলো না।

"গোটাকয়েক উদ্ভিদ বেশ ভালোরকম নজর করে দেখলেই বোধ হয় "আমরা তা জানতে পারবো," পরেশ বলে।

ছেলেমেয়েরা ঘরের মধ্যে যে ক'টা উদ্ভিদ ছিলো সেগুলোকে বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। ওরা দেখতে পেলো প্রত্যেক উদ্ভিদেরই শিকড় আছে, আর আছে ডাঁটা আর পাতা। কিন্তু তবুও ওরা বুঝতে পার'লোনা উদ্ভিদগুলো খাবার কী করে নেয়।

"আমি একটা বইয়ে এই মজার ছবিটা পেয়েছি," শেফালী এই বলে' বইটা তুলে দেখায় ওদের। "এই ছবিটা একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে একটা পাতার নীচের দিকটা দেখা যাচ্ছে। পাতার নীচের দিকটা মুখের মতো দেখতে ছোটছোট গর্তে ভরা। উদ্ভিদের বেড়ে উঠার জন্য যে হাওয়ার দরকার উদ্ভিদ সেই হাওয়া তার পাতার নীচেকার ছোটছোট গর্তগুলো দিয়ে টেনে নেয়।"

উদ্ভিদরা জল নেয়
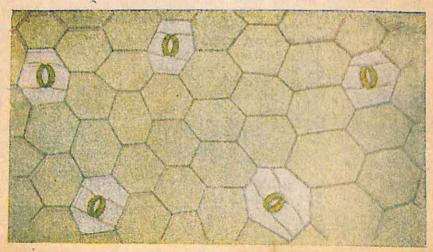
"আমি এই যে বইখানা পেয়েছি এতে উদ্ভিদ নিয়ে গোটাকয়েক পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে," বীরু বলে। "এসো না আমরাও গোটাকয়েক পরীক্ষা চালিয়ে দেখি। তা হ'লে হয়তো আমরা জানতে পারবো উদ্ভিদেরা কী করে' তাদের খাবার সংগ্রহ করে।"

"আমি কি সাহায্য করতে পারি?" পরেশ জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ, নিশ্চয় পারো," বীরু বলে।

তখন বীরু আর পরেশ এই পরীক্ষাগুলো ক'রে দেখে:

(১) ওরা একটা মাছ রাখার কাচের পাল্লা দেওয়া চৌবাচ্চা মাটি দিয়ে ভরাট করে' নেয়, তারপর চৌবাচ্চাটার একদিকে কাচের পাল্লাটার ধারে ধারে বীজ বুনে' দেয়। একটা ফুলের টবে জল ভরে' সেটা ওরা চৌবাচ্চাটার অন্য দিকে রেখে দেয়।

বীজগুলো অঙ্কুরিত হ'য়ে হ'য়ে চারা জন্মায়। সবগুলো চারারই শিকড়গুলো যেদিকে জল রাখা হয়েছিলো সেদিকে বাড়তে থাকে।
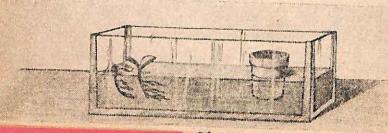
(২) ওরা একটা চারার শিকড়গুলো কেটে ফেলে চারাটাকে আবার মাটিতে পুঁতে দেয়। চারাটা শুকিয়ে মরে' যায়।

(৩) ওরা একটা বাড়ন্ত চারা থেকে দু'টো পাতা ছিঁড়ে নেয়। একটা পাতার বোঁটা ওরা জলে ডুবিয়ে রাখে। অন্য পাতাটা ওরা জলে রাখে না।

এর ফলে কী হয় তা ছবিতেই দেখা যাচ্ছে।

এভাবে পরীক্ষা করে' দেখতো ঠিক এরকমটাই হয় কি না। তুমি বলতে পারো কেন এরকম হয়?

উদ্ভিদরা খনিজ নেয়
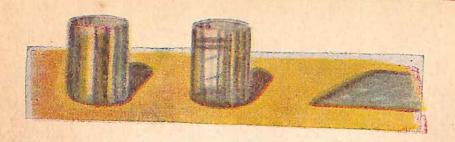
যখন বৃষ্টি হয় তখন বৃষ্টির জল মাটির ভিতরে ঢুকে যায়। উদ্ভিদদের শিকড়গুলো কিছু জল টেনে নেয়। সেই জল শিকড় থেকে ডাঁটার মধ্য দিয়ে পাতাগুলোতে চলে' যায়।

উদ্ভিদরা যে জল টেনে নেয় তাকে বলে মাটি-জল। জলের সঙ্গে কিছুটা মাটি মিশিয়ে তুমিও মাটি-জল তৈরী করতে পারো। সেই জলটা প্রথমে খুব ঘোলা হবে, কিন্তু কিছুক্ষণ একযায়গায় রেখে দিলে মাটিটা থিঁতিয়ে গিয়ে উপরের জলটা পরিষ্কার হ'য়ে আসবে।

সেই জলের কয়েকটা ফোঁটা একটুকরো পরিষ্কার কাঁচের উপর রেখে দাও। যতক্ষণ না জলের ফোঁটা গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁচের কোন গরম যায়গায় রেখে দাও। তারপর কাঁচটার দিকে তাকিয়ে দেখো। মাটির ভেতরকার যেসমস্ত খনিজ পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো তার কিছুকিছু তুমি কাঁচটার উপর দেখতে পাবে।

মাটি জল যখন উদ্ভিদের শিকড়ে চলে' যায় তখন তার সঙ্গে সঙ্গে খনিজগুলোও চলে' যায়। এভাবেই উদ্ভিদেরা খনিজ নেয়।

উদ্ভিদ খাবার তৈরী করে

উদ্ভিদরা যে তিনটি জিনিষ টেনে নেয় তা হ'লো

(১) হাওয়া
(২) জল
(৩) খনিজ

উদ্ভিদরা হাওয়া, জল ও খনিজ একত্র করে তাদের খাবার তৈরী করে।
হাওয়া, জল ও খনিজ থেকে উদ্ভিদরা ঠিক কীভাবে তাদের খাবার তৈরী করে তা কেউ জানে না। তবে এটুকু আমরা জানি যে আলো তাদেরকে একাজে অনেকখানি সাহায্য করে। কোন উদ্ভিদকে অন্ধকারে রেখে দিলে সেই উদ্ভিদ তার খাবার তৈরী করতে পারে না। উদ্ভিদরা তাদের পাতাগুলোর মধ্যে খাবার তৈরী করে।

উদ্ভিদরা খাবার জম্মায়

উদ্ভিদরা যতো খাবার তৈরী করে তা সব রাখবার মতো যায়গা পাতাগুলোর মধ্যে নেই। তাই সেই খাবারের অনেকখানিই উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে জমিয়ে রাখা হয়।

উদ্ভিদের যেসব অংশে সবচেয়ে বেশী খাবার জমিয়ে রাখা হয় আমরা সে অংশগুলো খাই। গাজর তার শিকড়ের মধ্যে খাবার জমিয়ে রাখে, তাই আমরা তার শিকড় খাই। কোন কোন উদ্ভিদ তাদের ডাঁটার মধ্যে খাবার জমিয়ে রাখে। আমরা সেসব উদ্ভিদের ডাঁটা খাই। আবার অনেকরকম উদ্ভিদ তাদের ফলের মধ্যে খাবার জমায়। আমরা তাদের জমানো খাবার নেবার জন্য সেসব উদ্ভিদের ফল খাই।

কয়েক রকম উদ্ভিদের আবার জমানো খাবার রক্ষা করবার উপায়ও জানা আছে। তাই গোলাপগাছে কাঁটা জম্মায় আর বিষাক্ত আইভি লতায় থাকে বিষ। তাছাড়া অনেকরকম উদ্ভিদ এতো শক্ত আর কর্কশ যে মানুষ কিংবা জীবজন্তু সেসব উদ্ভিদ খেতে পছন্দ করেনা।

বীজের মধ্যে অনেক খাবার জমা থাকে

বীজের মধ্যে যে শিশু চারা থাকে সে একেবারে ছোট্ট একটুখানি। বীজের ভিতরকার বাকী অংশটা সবখানিই খাবারে ভর্তি থাকে।

শিশু চারা যখন বাড়তে শুরু করে তখন তাদের এই খাবার দরকার হয়। কারণ যতক্ষণ না তারা বড়ো হ'য়ে পাতা মেলতে পারে ততোক্ষণ তো তারা আর খাবার তৈরী করতে পারে না। তাই, যতো দিন শিশু চারাগাছ নিজের খাবার নিজে তৈরী করতে পারেনা ততো দিন তাকে বীজের মধ্যে জমিয়ে রাখা খাবারের উপরেই নির্ভর করতে হয়।

বীজের মধ্যে খাবার জমা থাকে বলে বীজ জীবজন্তুদের পক্ষে খুব ভালো খাবার। তুমি কি এমন কয়েকরকম জীবজন্তুর নাম বলতে পারো যারা বীজ খায়?

মানুষ যেসমস্ত খাবার খায় তার বেশীর ভাগই আসে বীজ থেকে। কোন কোন খাবার আসে গমগাছের বীজ থেকে। তুমি কি অন্য কোন বীজের নাম জানো যা আমরা খাবার হিসাবে ব্যবহার করি?
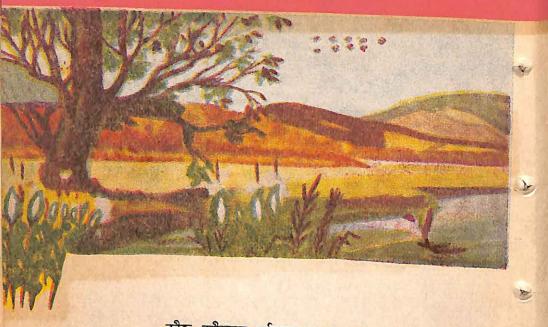
বীজ কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়

শরৎকালে যখন জোরে হাওয়া বইতে থাকে তখন বেড়াতে বেড়িয়ে নজর রাখলে দেখতে পাবে যে হাওয়া অনেক রকম বীজ বহন করে' নিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বাড়ীর কুকুরটা যদি তোমার সঙ্গে থাকে তবে দেখবে যে তার গায়ের লোমে কিছু কিছু বীজ আটকে আছে। তোমার নিজের জামাকাপড়েও কিছুকিছু বীজ লেগে থাকবে। এভাবে তোমরাও বীজ ছড়াতে সাহায্য করছো।

কোন কোন জীবজন্তু শরৎকালে বীজ সংগ্রহ করে। শীতকালে খাবার জন্য তারা বীজগুলো মাটির নীচে লুকিয়ে রাখে। কখনো কখনো জীবজন্তুরা ভুলে যায় কোথায় কোথায় তারা বীজ লুকিয়ে রেখেছিলো।
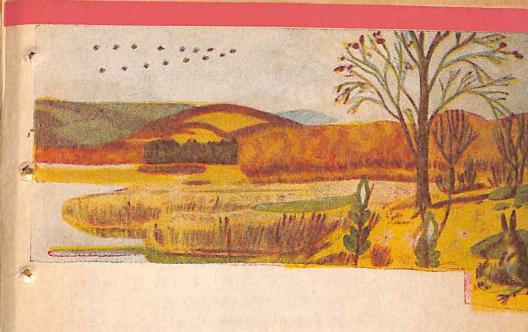
পরে সেই বীজগুলো এমনভাবে বাড়তে থাকে যেন সেগুলোকে রোপণ করা হয়েছিলো।

আরও নানান রকমে বীজ নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্যি সেসব ছড়িয়ে পড়া বীজের সবগুলোই যে বেড়ে উঠবার পক্ষে উপযুক্ত যায়গায় পড়ে তা বলা যায়না। তবে কিছু কিছু নিশ্চই পড়ে। বসন্তকালে শিশু চারারা প্রথমে বীজের মধ্যে জমানো খাবার ব্যবহার করে। তারপর তারা আরও খাবার তৈরী করতে শুরু করে।

উদ্ভিদরা যে হাওয়া, জল ও খনিজ একত্র করে খাবার তৈরী করতে পারে তাতে আমাদের পরম উপকার। কারণ এরকম না হলে কোন জীবজন্তু বা মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব হ'তো না।

যা করতে হবে

(১) একটা গাজর চিরে **দেখো** কীভাবে তার মধ্যে খাবার জমানো থাকে।

(২) একটা পিঁয়াজের খোসা ছাড়াও। খোসাগুলো আসলে পাতা। ওগুলোর মধ্যে খাবার জমানো আছে বলেই পাতাগুলো এতো মোটা।

(৩) কিছু ঘাস উপড়ে নিয়ে সেগুলোর ডাঁটার যে সাদা অংশটা মাটির নীচে থাকে সেগুলো লক্ষ্য করে দেখো। এই অংশে যে খাবার জমানো থাকে তা ব্যবহার করে' ঘাসগুলো পরের বছর বাড়তে সুরু করবে।

(৪) যতোরকমের পারো বাদাম সংগ্রহ করো। তাদের নামগুলো জানতে চেষ্টা করো।

(৫) আরও নানান রকমের বীজ সংগ্রহ করো।

সঠিক উত্তর বের করো

(এই বইয়ে না লিখে উত্তরের জন্য অন্য কাগজ ব্যবহার করো)

(১) এ না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না
কীটপতঙ্গ গোরু নৌকা উদ্ভিদ

(২) উদ্ভিদের শিকড় টেনে নেয়
হাওয়া জল মাটি কীটপতঙ্গ

(৩) গাজরগাছ তার খাবার জমিয়ে রাখে
শিকড়ে ডাঁটায় পাতায় ফুলে

(৪) মানুষ যেসব খাবার খায় তার বেশীর ভাগই আসে এই থেকে
মৌমাছি ডাঁটা গোরু বীজ

তুমি কি জানো ?

(১) কী কী তিনরকম উপায়ে বীজ ছড়িয়ে পড়ে।

(২) কী কী তিনরকম জিনিষ দিয়ে উদ্ভিদরা তাদের খাবার তৈরী করে।

(৩) উদ্ভিদের তিনটি অংশ কী কী।

(৪) কোন তিনটি যায়গায় উদ্ভিদরা তাদের খাবার জমিয়ে রাখে।

(৫) কী কী তিনটি উপায়ে উদ্ভিদরা নিজেদেরকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন

(১) খাদ্য-নির্মাতা কারা ?
(২) খাদ্য-নির্মাতাদের সকলের রঙ কী রকম ?
(৩) উদ্ভিদরা মাটি থেকে কী নেয় ?
(৪) উদ্ভিদের পাতা কী. কীজে লাগে ?
(৫) মাটি-জল কাকে বলে ?
(৬) উদ্ভিদরা কী করে হাওয়া নেয় ?
(৭) মানুষ উদ্ভিদের কোন কোন অংশ খায় ?
(৮) উদ্ভিদের কোন অংশে খাবার তৈরী হয় ?
(৯) শিশু চারার পক্ষে জমানো খাবার দরকারী কেন ?
(১০) কেমন করে বীজদের বাড়বার উপযুক্ত যায়গা মেলে ?

পরিবর্তনশীল পৃথিবী
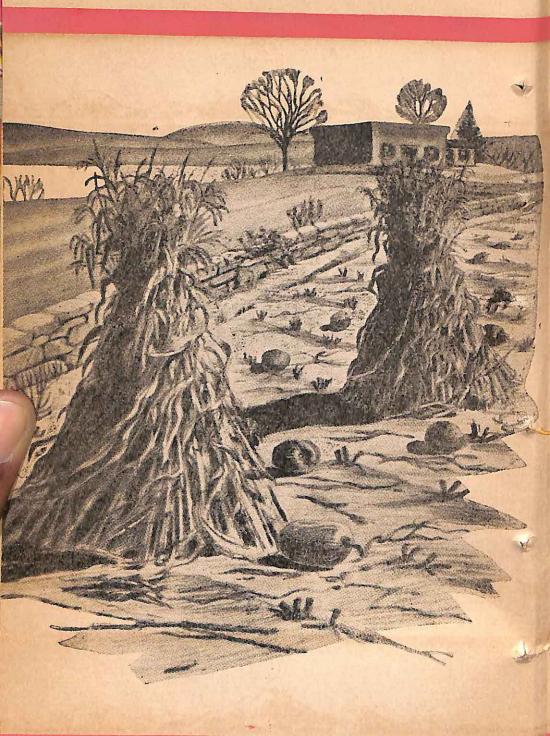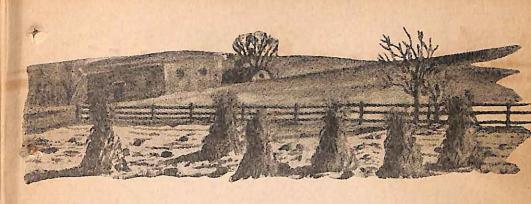
শরতের আবহাওয়া

শরৎকালে আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার থাকে। দিনগুলো আগের চেয়ে ঠাণ্ডা হ'তে সুরু করে। বেশীর ভাগ দিনই আকাশের রঙ গাঢ় নীল থাকে। ভোরবেলায় দেখা যায় মাঠের ঘাসগুলো শিশিরে ভিজে আছে। এসময় গ্রামে গ্রামে চাষীরা ফসল কাটে। ফসলের শুকনো চারাগুলো কেটে জড়ো করে' তার খড়ের গাদা সাজিয়ে রাখে।

আবহাওয়া ঠাণ্ডা হ'তে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতাগুলোর রঙ বদলাতে থাকে। কোন কোন গাছের পাতা লাল হ'যে যায়, কোন কোন গাছের পাতা হ'য়ে যায় হলদে অথবা বাদামী। তারপর একটা একটা করে' পাতাগুলো ঝরে' পড়তে থাকে। ঝোপগুলোর চারপাশে আর বেড়ার ধারে ধারে ঝরাপাতার স্তূপ জমে উঠে।

গাছ থেকে যখন পাতাগুলো ঝরে' পড়তে থাকে তখন জীবজন্তুরাও ব্যস্ত হ'য়ে উঠে। কোন কোন জীবজন্তু এসময় থেকেই তাদের শীতকালের খাবার জমাতে সুরু করে।
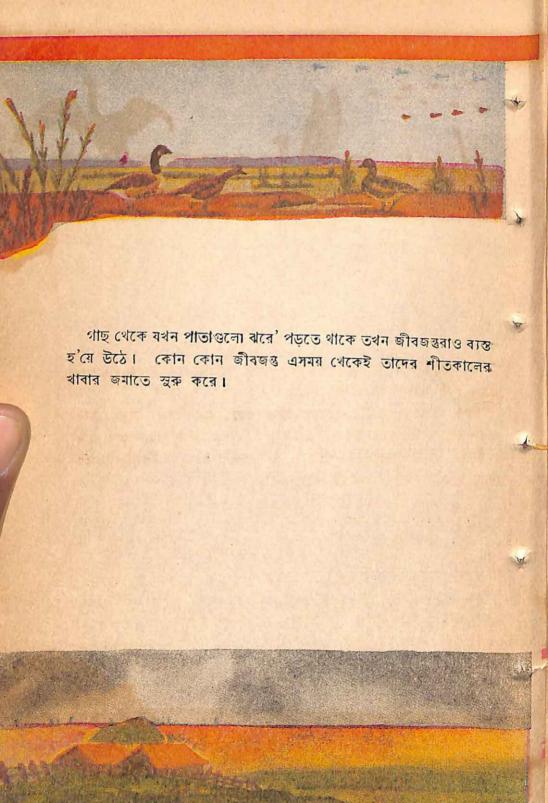
শরৎকালে নদী আর জলাশয়গুলো কানায় কানায় ভরে' থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস আর সারস সেখানে তাদের খাবার খুঁজতে আসে।

কিন্তু কখনো কখনো শরৎকালেও বেশ বৃষ্টি হয়। নদী আর জলাশয়গুলো আগে থেকেই ভরা থাকে বলে' সেগুলোতে তখন আর জল ধরেনা। সেই বাড়তি জল তখন নদীর কূল ছাপিয়ে মাঠঘাটের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। একেই বলে বন্যা।
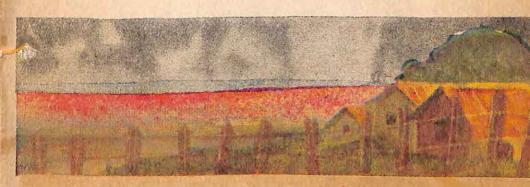
জলের স্রোত কী করে জমির পরিবর্তন ঘটায়

একদিন সকালবেলা যতীন সবে খেতে বসেছে এমন সময় পরেশ এসে হাজির যতীনদের বাড়ীতে। পরেশকে দেখে খুব উত্তেজিত বোধ হচ্ছিলো।

"সহরতলীতে বন্যা হয়েছে," পরেশ বলে যতীনের মাকে। "যতীন কি আমার সঙ্গে বন্যা দেখতে যাবে?"

"আমার ভয় হয় যাবার পক্ষে ওযায়গাটা নিরাপদ হবেনা," যতীনের মা বলেন।

"আমিও বন্যা দেখতে যাচ্ছি," যতীনের দাদা বীরেশ বলে। "যতীন আর পরেশ আমার সঙ্গে যেতে পারে। আমি ওদেরকে দেখবোখন।"

যতীনের মা তখন বললেন যে ওরা যেতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ওদেরকে বিপদ আপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকবার জন্য সাবধান করে দিলেন।
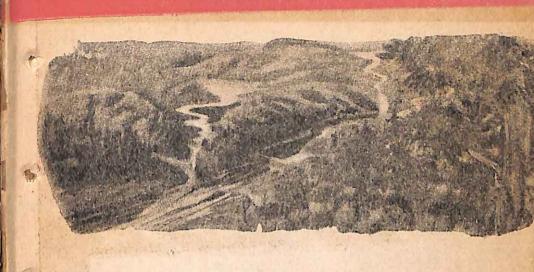
"নদীর এপারে যেখানে তীরটা বেশ উঁচু সেযায়গাটা আমার জানা আছে," বীরেশ বলে। "সেখান থেকে বেশ ভালো দেখা যাবে।"

ওরা নদীর ধারে পৌঁছুবার আগেই বন্যার কিছু কিছু দৃশ্য দেখতে পায়। কারণ নদীর জল দুই তীর ছাপিয়ে উঠার দরুণ গোটাকয়েক রাস্তাও জলে ডুবে গিয়েছিলো।

নদীর ধারে এসে ওরা আসল বন্যা দেখতে পেলো। নদীর জল বিদঘুটে রকম ঘোলা, আর সেই ঘোলা জলের উপর দিয়ে কাঠের টুকরা, গাছের গুঁড়ি, আস্ত গাছ এমনকি ঘরবাড়ীর অংশ পর্যন্ত ভেসে চলেছে।
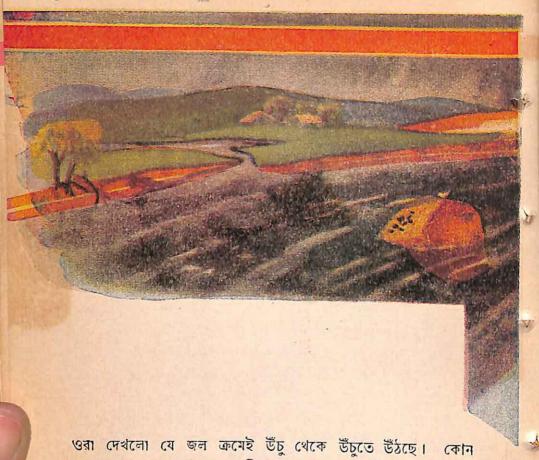
ওরা দেখলো যে জল ক্রমেই উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছে। কোন কোন যায়গায় জল সেখানকার বাড়ীগুলোর জানালা অবধি ঠেলে উঠেছে। লোকেরা নৌকা করে' এসে বাড়ীর লোকজনদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন বাড়ী জলের চাপে ভিৎ থেকে আলগা হ'য়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে।

ওরা সারাদিন বন্যা দেখলো। ওরা দেখলো যে চেয়ার টেবিল খেলনা ও বাড়ীঘরের অংশ নদীর স্রোতে ভেসে গেলো। যাদের বাড়ী-ঘর এভাবে ভেসে গেলো তাদের জন্য ওদের খুব দুঃখ হ'লো, তবুও বন্যা দেখতে ওদের ভালোই লাগলো।

পরের দিন বন্যার জল নীচের দিকে নামতে লাগলো। জল বেশ খানিকটা নীচে নেবে যাবার পর ওরা দেখতে পেলো বন্যা কী কাণ্ডটা করে গেছে। কোন কোন যায়গায় মাটি স্রেফ্ ধুয়ে গেছে, আবার কোন কোন যায়গায় পাথর মাটি আর ঘরবাড়ীর অংশের স্তূপ জড়ো হয়েছে।

বন্যা সরে যাবার পর দেখা গেলো যে অনেক কিছুরই যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। কোন কোন যায়গায় জমিতে খালের মতো গভীর গর্ত হয়ে গেছে। আবার কোন যায়গায় জমি কাদামাটি আর পাথরে ঢাকা পড়ে গেছে। কোন কোন যায়গায় জলের স্রোত জমি থেকে সমস্ত মাটি ধুয়েমুছে নিয়ে গেছে, আবার কোন কোন যায়গায় মাটি সাজিয়ে দিব্যি নতুন জমি তৈরী করে দিয়ে গেছে।

চলন্ত হাওয়া কী করে' জমির পরিবর্তন ঘটায়

আমাদের দেশের যেসব যায়গা খুব শুকনো খটখটে তাদের একটিতে থাকে দু'টি ছেলে। তাদের নাম রাজীব আর মহেন্দ্র। রাজীব আর মহেন্দ্র কোন দিন বন্যা দেখেনি, এমনকি নদীও দেখেনি। সত্যি কথা বলতে কি ওরা খুব বেশী বৃষ্টিও দেখেনি।

রাজীব একদিন তার টাট্টু ঘোড়ায় চেপে বন্ধু মহেন্দ্রের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। মহেন্দ্রও তার টাট্টু ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে তৈরী হ'য়ে নিলো। তারপর দুই বন্ধুতে টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে একসঙ্গে বেড়াতে বেরুলো।

বেড়ানো শেষ করে' সবে বাড়ীমুখো হয়েছে এমন সময় তারা দেখতে পেলো দূরে ঘন কালো মেঘ করেছে। মেঘটা ক্রমেই তাদের পানে এগিয়ে আসছে।

এই মেঘটা আসলে কী তা মহেন্দ্রের জানা ছিলো। সে বললো, ''আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'' ওরা টাট্টু দু'টোকে প্রাণপণে ছুটিয়ে দিলো।

কিন্তু বেশী দূর এগোবার আগেই মেঘটা ওদেরকে ধরে' ফেললো। সেটা আসলে ছিলো ধুলো-ঝড়। ধুলোবালি ওদের নাকে-চোখে ঢুকতে লাগলো, আর সেই ঘন ধুলোর পর্দার মধ্য দিয়ে ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না।

"তুমি কি বাড়ী ফেরার পথ খুঁজে বের করতে পারবে?" রাজীব জিজ্ঞাসা করে। "আমি কিন্তু পারবো না।"

"বোধ হয় পারবো," মহেন্দ্র বলে। "এখানে একটা বেড়া শুরু হয়েছে, আর এই বেড়াটা শেষ হয়েছে পশু-পালনের খামারটার কাছে। আমি আগে আগে যাচ্ছি, তুমি আমার পিছন পিছন এসো।"

ওরা টাট্টু থেকে নেমে টাট্টু দু'টোর লাগাম ধরে' হাঁটতে লাগলো। ধুলোর পর্দাটা ক্রমেই এতো ঘন হতে লাগলো যে, রাজীব আর মহেন্দ্র আর চোখ মেলে তাকাতে পারছিলো না। ওরা বেড়াটা হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে লাগলো।

এভাবে অনেক্ষণ চলার পর ওরা গোলাঘরের কাছে এসে পেঁছলো। তখন ওরা টাট্টু দু'টোকে ভেতরে রেখে আস্তে আস্তে সতর্কভাবে হেঁটে হেঁটে বাড়ী এলো।
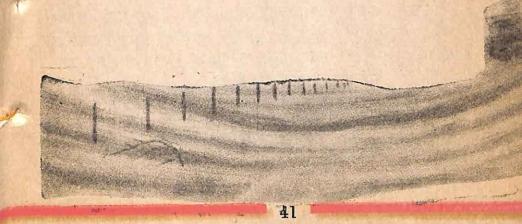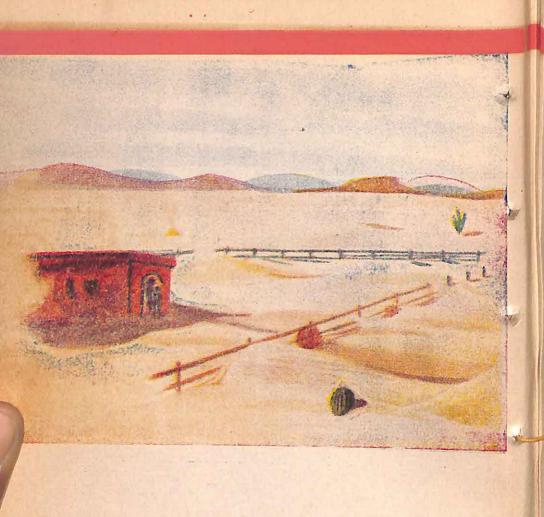
ইতিমধ্যে বাড়ীটা ধূলোয় ভরে গেছে। দরজা, জানালার ফাঁকের ভিতর দিয়ে রাশিরাশি ধূলো এসে ঘরের মেঝেটাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। এমনকি খাবার জিনিষের মধ্যেও ধূলো এসে ঢুকেছে। পুরো দু'দিন ধরে' এরকম ধূলো-ঝড় হ'লো।

ঝড় থেমে যাবার পর রাজীব আর মহেন্দ্র কোথায় কী হয়েছে তা দেখতে বেরুলো।
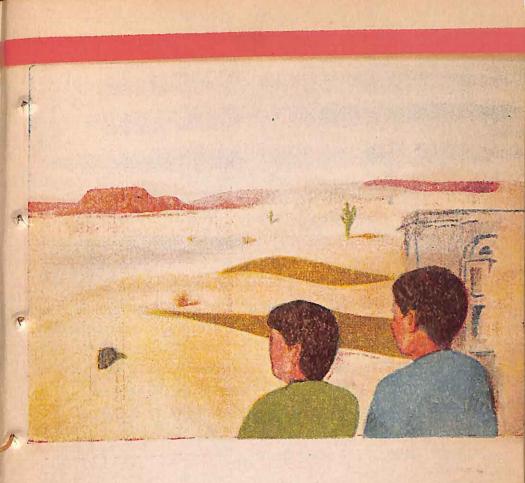
বেড়ার ধারে ধারে আর বাড়ীগুলোর কাছে ধূলোর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ জমে গেছে। বাগানের চারাগাছগুলো উধাও হ'য়ে গেছে। কয়েকটা ক্ষেতের মাটি পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়ে। ঝড়ে কোন কোন যায়গা থেকে মাটি উড়িয়ে নিয়ে অন্য যায়গায় নিয়ে ফেলেছে।

ঢেউ

যখন জোরে হাওয়া বইতে থাকে তখন সেই হাওয়া সাগরের বুকে ঢেউ তোলে। সাগরের ঢেউ প্রায়ই এক একটা বাড়ীর সমান উঁচু হয়।

ঢেউগুলো তীরের পাথরের উপর আছড়ে পড়ে। তাতে অনেক সময় পাথরের টুকরো খসে যায়। খসে-যাওয়া পাথরের টুকরোগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার পাথরের উপর ছিটকে পড়ার দরুণ আরও পাথর খসে আসে আর ভেঙে গুড়ো হয়ে যায়। বারে বারেই এরকম হয়। এভাবে সমুদ্রের ঢেউ পাথর গুড়ো করে বালি তৈরী করে।

এভাবে যে বালি তৈরী হয় তার বেশীর ভাগই সাগরের জলে মিশে যায়। কিছু টা সাগরের জলের নীচে থাকে, আবার কিছুটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে তীরে এসে পৌঁছয়। ঢেউও কোন কোন যায়গায় মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়, আবার কোন কোন যায়গায় মাটি দিয়ে নতুন জমি তৈরী করে' দেয়।

আগ্নেয়গিরি

পৃথিবীর গভীর স্তরে পাথরগুলো এতো গরম হয় যে সেগুলো অনেক সময় গলে যায়। কখনো কখনো সেই গলিত পাথর মাটির উপরে উঠে এসে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করে।

গলিত পাথর যেখানে নীচ থেকে উপরে ঠেলে উঠে সেখানে মাটির উপরে পাহাড়ের মতো উঁচু ঢিবি হ'য়ে যায়। সেই পাহাড়ের চূড়ার মধ্য দিয়ে গলিত পাথরের স্রোত বের হ'তে থাকে তারপর সেই স্রোত পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে আবার কঠিন পাথর হয়ে যায়। আগ্নেয়-গিরি থেকে যে পাথর বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় 'লাভা'।

এরকম পাহাড়ের কাছে কখনো কখনো সহর থাকে। সেই সহর-গুলো অনেকসময়ে লাভায় ঢাকা পড়ে যায়। লাভা যখন ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন সেই সহরগুলো কঠিন পাথরে চাপা পড়ে যায়।

আগ্নেয়গিরি অনেক যায়গায় জমি তৈরী করে' দেয় ; আগ্নেয়গিরি কখনো জমি থেকে মাটি ধুয়ে নেয়না।

পাথর কী ভাবে গড়ে উঠে

পৃথিবীর কোন কোন অংশ যেমন ক্ষয় পাচ্ছে তেমনি আবার কোন কোন অংশ নতুন করে' গড়ে উঠছে। নতুন পাথর গড়ার মধ্য দিয়েও এভাবে পৃথিবীর নতুন নতুন অংশ গড়ে উঠছে। আজকাল অনেক যায়গাতেই নতুন পাথর গড়ে উঠছে, সেগুলোর বেশীরভাগই গড়ে উঠছে পুরানো পাথরের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে। পাথর গড়ে উঠতে অনেক সময় লাগে।

জলের নীচে অনবরত অনেকরকম নতুন পাথর গড়ে উঠছে। এক-রকম পাথর গড়ে উঠছে বালি থেকে। সমুদ্রের জল তার তলার বালি-কণাগুলোর উপর চেপে থাকে, সেই চাপে অনেক বছর পরে সেগুলো মিশে গিয়ে পাথর হ'য়ে যায়। এই রকম পাথরকে বলা **হয় বেলে** পাথর।
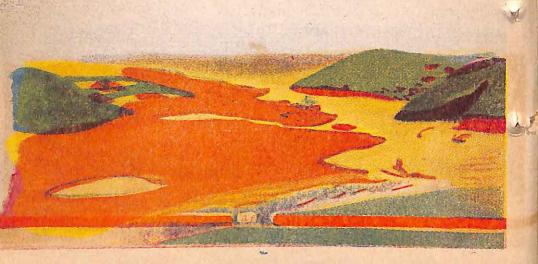
আর এক রকম পাথর তৈরী হয় মাটি থেকে। যখন বৃষ্টি হয় তখন বৃষ্টির জল জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে যাবার সময় কিছু কিছু মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়। জলের সঙ্গে মাটি মিশে জল ঘোলা হ'য়ে যায়। সেই ঘোলা জল প্রথমে নদীতে, অবশেষে সাগরে গিয়ে মেশে। ক্রমে সেই মাটি সাগরের তলায় থিতিয়ে যায়। অনেক বছর পরে তা কঠিন পাথর হয়ে যায়। শ্লেটের মতো কিন্তু শ্লেটের চেয়ে নরম এধরণের পাথরকে বলে মেটেপাথর।

তৃতীয় এক ধরণের পাথর তৈরী হয় জীবজন্তুর খোলা থেকে। অনেক রকম জলচর জীবজন্তুর খোলা থাকে। সেই জীবজন্তুগুলো যখন মরে' যায় তখন তাদের খোলাগুলো সাগরের তলায় ডুবে যায়। সেখানে কোন কোন যায়গায় খোলার স্তূপগুলো কয়েকশো' ফুট গভীর। অনেক বছর পর খোলাগুলো জমে পাথর হ'য়ে যায়। এই ধরণের পাথরকে বলে চুনাপাথর।

ধুলো কী ভাবে পৃথিবী গড়ে
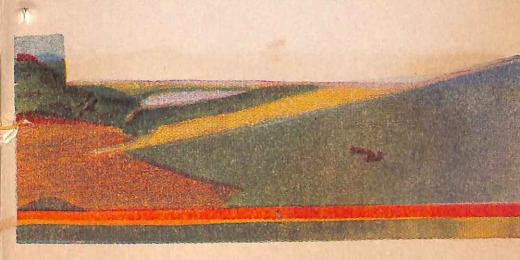
অনেক দিন ধরে ব্যবহার করা হয়নি এমন কোন ঘরে যদি ঢোকো তবে দেখতে পাবে যে সবকিছুই ধূলোয় ঢেকে আছে। এই সবখানি ধূলোই এসেছে ঘরের হাওয়া থেকে।

ঝড়ে যে ধূলো উড়িয়ে হাওয়ায় মিশিয়ে দেয় সে ধূলোর কথা একবারটি ভেবে দেখো। সেই ধূলোর সবখানিই পৃথিবীর কোন না কোন যায়গায় নামবেই তো। ঝড় থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিছুটা ধূলো মাটিতে নেমে আসে, আর কিছুটা নামে বৃষ্টির সঙ্গে।

কোন কোন যায়গায় হাওয়া থেকে এতো ধূলো পড়ে যে সেখানকার জমি দিনের পর দিন উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। অনেক প্রাচীন সহর ধূলোর স্তূপের মধ্যে এমন বেমালুম চাপা পড়ে গেছে যে সেগুলিকে আজকাল খুঁজে বের করাই মুস্কিল। এই প্রাচীন সহরগুলির কয়েকটিকে অনেক মাটি খুঁড়ে আবার আবিস্কার করা হয়েছে।

চা-খড়ি কী ভাবে তৈরী হয়

আমরা যখন ব্ল্যাকবোর্ডে লিখি তখন আমরা একরকম পাথর ব্যবহার করি যা জীবজন্তু থেকে আসে। এক টুকরো চা-খড়ির জন্য লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট জীবজন্তুর খোলশ দরকার হয়।

যে জীবজন্তুগুলোর খোলা থেকে চা-খড়ি তৈরী হয়েছে সেগুলো অ-নে-ক বছর আগে বেঁচে ছিলো। সেগুলো মরবার সময় তাদের খোলাগুলো সাগরের তলায় ডুবে যায়। তারপর বছরের পর বছর পুরানো খোলা-গুলোর উপর নতুন নতুন খোলা জমা হতে থাকে এবং সেগুলো সাগরের তলায় স্তূপাকার হয়ে উঠে। তারপর আরও অ-নে-ক বছর পরে সেগুলো চা-খড়ি হ'য়ে যায়।

তুষার স্রোত

পৃথিবী একসময় এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা ছিলো। পৃথিবী এতো ঠাণ্ডা ছিলো যে আমাদের দেশের অনেক যায়গাও তখন বরফে ঢাকা ছিলো। কোন কোন যায়গায় সেই বরফ হাজার হাজার ফুট গভীর ছিলো।

বিশাল যায়গা জুড়ে বিস্তীণ এই ধরণের বরফকে বলে তুষার স্রোত। উত্তর থেকে তুষারস্রোত ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগলো। সেটা এতো ভারী ছিলো যে তার সামনে যা কিছু পড়তো তাই ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো। তার ঠেলায় পাহাড় পর্বতগুলো আগে যেখানে ছিলো সেখান থেকে দূরে ছিটকে পড়লো, আর অনেক বড়ো বড়ো পাথর গুড়িয়ে গেলো।

অনেক রকম জীবজন্তু বরফে জমে' গেলো। আরও অনেক রকম জীবজন্তু খাবার জিনিষের অভাবে মরে গেলো। কোন কোন জীবজন্তু দক্ষিণে পালিয়ে এসে বাঁচলো।

তুষারস্রোত যেসব কাণ্ডকারখানা করেছিলো সেগুলোর কিছু কিছু চিহ্ন আমরা এখনো দেখতে পাই। তুষারস্রোতের বরফগুলো গলে' যাবার পর সেই জলে কোন কোন যায়গায় হ্রদ হ'য়ে গেলো। কোন কোন যায়গায় মাটি আর পাথরের স্তূপ জমে পাহাড় হ'য়ে গেলো। তুষারস্রোতের ঠেলায় পাথরে পাথরে ঘসে যে আঁচড় পড়েছিলো অনেক পাথরের উপর আজও সেই আঁচড়ের দাগ দেখা যায়।

গুহাবাসী মানুষ

অতীতকালে যেসমস্ত পরিবর্তন ঘটেছিলো সেগুলোর কিছুকিছু আমরা গুহাবাসী মানুষদের কাছ থেকে জানতে পারি। অবশ্যি গুহাবাসী মানুষ এখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু তারা যে গুহাগুলোতে থাকতো সেগুলোর কয়েকটা আবিষ্কার করা হয়েছে। এই গুহাগুলোর দেয়ালে দেয়ালে গুহাবাসী মানুষরা যেসব ছবি এঁকেছিলো সেগুলো এখনও দেখা যায়। এগুলোর বেশীর ভাগই সেই সব জীবজন্তুর ছবি যেগুলো আজকাল আর পৃথিবীতে বেঁচে নেই।

অতীতের পরিবর্তন সম্বন্ধে জানবার আরও একটা উপায় হ'লো মাটি খুঁড়ে পুরানো কঙ্কাল তুলে দেখা। অতীতে পৃথিবীতে যেসব জীবজন্তু বাস করতো সেরকম অনেক জীবজন্তুর হাড় মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। এরকম হাড় যখন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় তখন হাড়ের সঙ্গে হাড় মিলিয়ে জানা যায় জন্তুটা কী রকম দেখতে ছিলো। এদের অনেকগুলিই কিন্তু দেখতে আজকালকার জীবজন্তুদের মতো ছিলোনা।
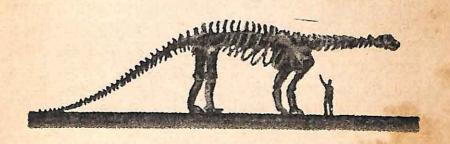
কোন কোন যায়গায় গুহাবাসী মানুষদের হাড়ও পাওয়া গেছে। সেই সব হাড় থেকে জানা যায় যে তখনকার মানুষরাও আজকালকার মানুষদের মতো ছিলোনা। আমাদের তুলনায় কোন কোন গুহাবাসী মানুষের পা'গুলো ছিলো বেঁটে আর হাতগুলো ছিলো লম্বা।

মানুষ কী ভাবে পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটায়

কলম্বাস যখন ভারতের সন্ধানে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন তখন সেদেশের বেশীর ভাগই জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো। অন্যান্য অংশে প্রচুর ঘাস জন্মাতো, সেখানে দলে দলে তৃণভোজী জীবজন্তু চরে' বেড়াতো। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বলা হ'তো 'ইণ্ডিয়ান'। 'ইণ্ডিয়ানদের' আমল থেকে এপর্যন্ত আমেরিকায় কতখানি পরিবর্তন ঘটেছে একবার ভেবে দেখো তো।
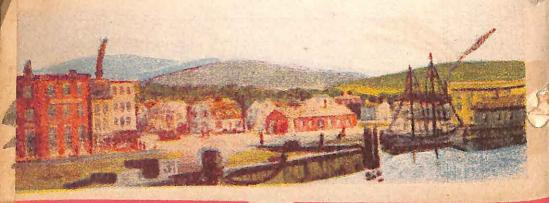
সেকালে যেখানে ছিলো শুধু বন্য জীবজন্তু আর উদ্ভিদ আজকাল সেখানে গড়ে উঠেছে বিরাট সহর। একসময় যেখানে ছিলো শুধু অরণ্য আর তৃণপ্রান্তর এখন সেখানে হয়েছে বড়ো বড়ো খামার আর পশুপালন ভূমি। নানান যায়গায় পুল আর খাল নির্মাণ করা হয়েছে, খনি খোঁড়া হয়েছে। আজকাল সেখানে সিমেণ্ট বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে মোটর গাড়ী ও লরীগুলি চলাচল করে, আর ইস্পাতের লাইনের উপর দিয়ে রেলগাড়ী ছুটে যায় হুঁহুঁ করে'। সেখানকার নদী আর হ্রদগুলিতে ষ্টীমার চলাচল করে।
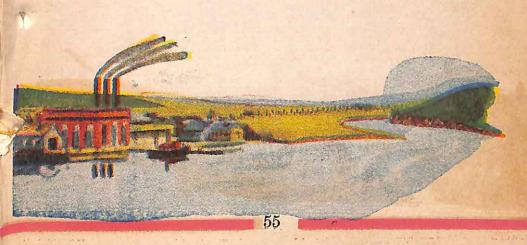
বালির টেবিলে পৃথিবী

যাতে জল ধরে এমন একটি বালির টেবিল যদি তোমার থাকে তবে জমি কী ভাবে গড়ে' উঠে আর ক্ষয় পায় সে সম্বন্ধে অনেক মজার জিনিষ দেখতে পারো। মনে করো বালির টেবিলটা হ'লো পৃথিবীর একটা অংশ। বালির টেবিলটার একদিকে মাটি আর বালি চাপিয়ে দাও। সেই মাটি আর বালির উপর গোটাকয়েক পাহাড় তৈরী করো। এবার সেগুলোর উপর জলবৃষ্টি করো।

বালির টেবিলে যখন বৃষ্টি হয় তখন জল কোথায় যায়? ছোট ছোট স্রোতের জলগুলো ঘোলা হয় তো? জমিতে নদী তৈরী হয় তো? তারপর নদীগুলো ক্রমেই গভীর হতে থাকে না? কিছু কিছু বালি কি বালির টেবিলের সাগরে চলে যায় না? সেই বালি কি সাগরের তলায় থিঁতিয়ে যায় না?

হাওয়া কী করে পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটায় তা দেখবার জন্যও বালির টেবিলটা ব্যবহার করতে পারো। বালির টেবিলটার ধারে একটা টেবিল ফ্যান বসিয়ে দাও। ফ্যানটা চালিয়ে বালির টেবিলের সাগরে ঢেউ তোলো। জমির উপরেও হাওয়া দেও। বালির কণাগুলো হাওয়ায় কী ভাবে উড়ে যায় তা লক্ষ্য করো। লক্ষ্য করো কী বেশী সহজে উড়ে যায়—শুকনো মাটি না ভিজে মাটি! যে বালি ও মাটি হাওয়ায় উড়ে যায় তার কী হয়?

যা করতে হবে

(১) যেসব যায়গায় জলের স্রোতে জমির পরিবর্তন ঘটেছে তাদের কয়েকটা যায়গার ছবি যোগাড় করো।

(২) বিবর্ধক কাচের মধ্য দিয়ে বালি দেখো।

(৩) সিমেণ্ট দিয়ে একখানা ইট তৈরী করো। সিমেণ্ট আর বালি জল দিয়ে মিশিয়ে নাও, তারপর একটা ছোট বাক্সের মধ্যে ঠেসে শুকোতে দাও।

(৪) নানারকম পাথর সংগ্রহ করো। বেলেপাথর, চুনাপাথর, মেটে পাথর ও অন্যান্য পাথর যোগাড় করো।
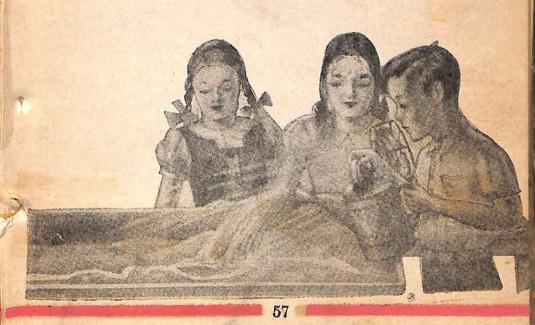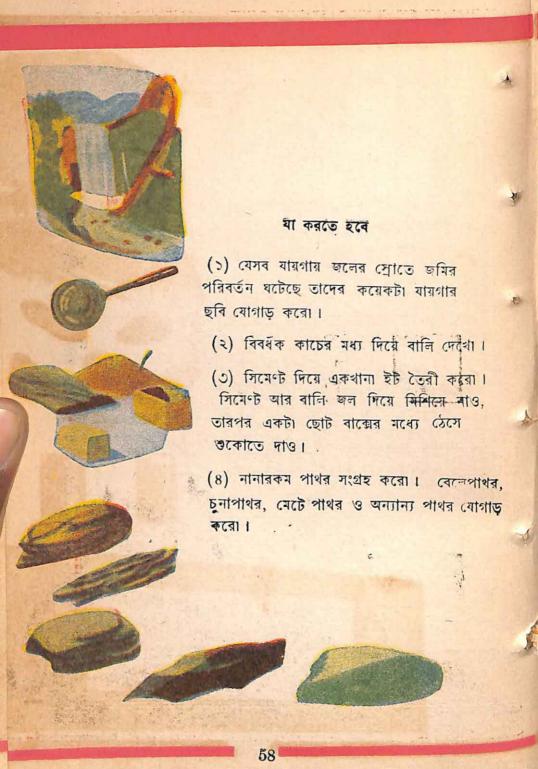
(৫) যেসমস্ত উদ্ভিদ ও জীবজন্তু বহুকাল আগে পৃথিবীতে ছিলো সেগুলোর ছবি যোগাড় করো।

(৬) জলচর জীবগুলোর খোলা যোগাড় করো।

(৭) কিছু ঘোলা জল একটা কাঁচের পাত্রে রাখো। দেখো মাটি আর বালি কী ভাবে পাত্রের তলায় থিঁতিয়ে যায়।

(৮) যেসব জিনিষ পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটায় তাদের একটা তালিকা তৈরী করো।

যা পৃথিবীর চেহারা বদলে দেয়

	জীবজন্তু
হাওয়া	শস্য
জল	মানুষ
আগুন	আগ্নেয়গিরি

বলতে পারো?

(এই বইয়ে না লিখে উত্তরের জন্য অন্য কাগজ ব্যবহার করো।)

এই শব্দগুলোর কোনটা নীচের কোন প্রশ্নের উত্তর?

তুষারস্রোত	চুনাপাথর	মেটেপাথর
বেলেপাথর	মাধ্যাকর্ষণ	লাভা

(১) আগ্নেয়গিরি থেকে কী ধরণের পাথর আসে?
(২) বালি থেকে কী ধরণের পাথর তৈরী হয়?
(৩) খোলা থেকে কী ধরণের পাথর তৈরী হয়?
(৪) মাটি থেকে কী ধরণের পাথর তৈরী হয়?
(৫) জল পাহাড় থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে কেন?
(৬) জমি বরফে ঢেকে গিয়েছিলো কেন?

তিনটে জিনিষের নাম করো

যা জমি গড়ে' তোলে:	যা জমি ক্ষয় করে:
(১)	(১) ....
(২)	(২) ....
(৩)	(৩) ....

তাপ

কী করে' আগুন লাগলো
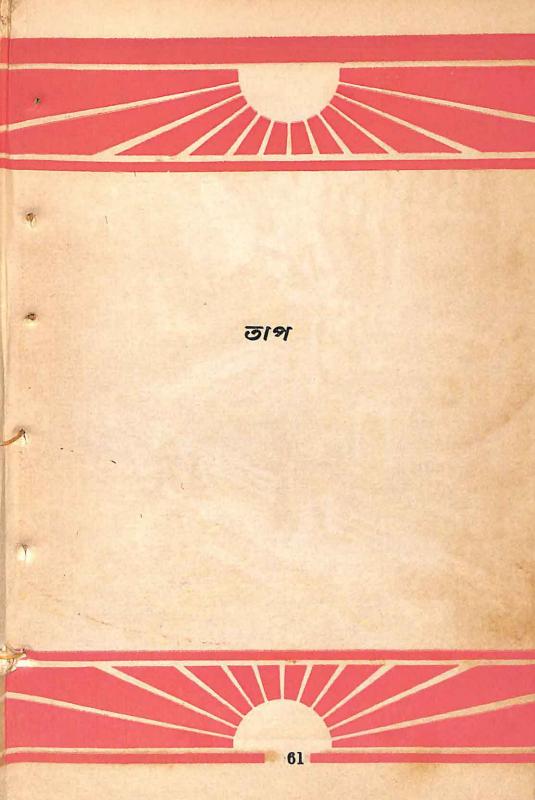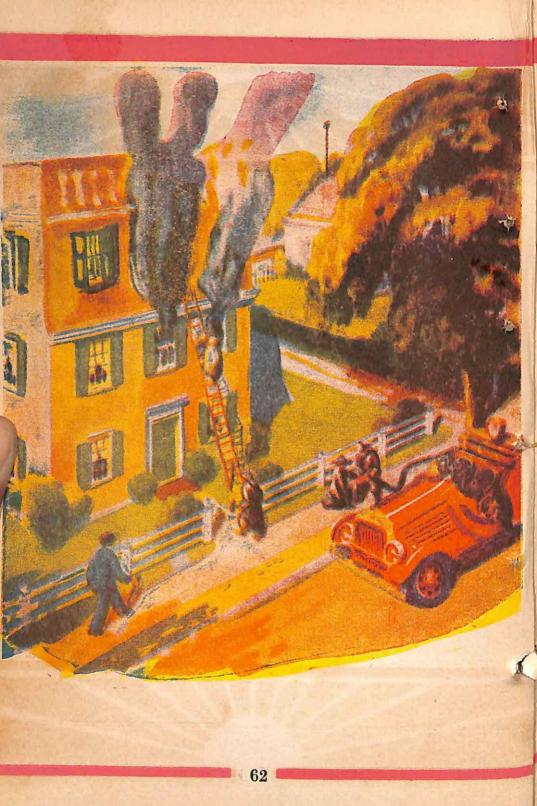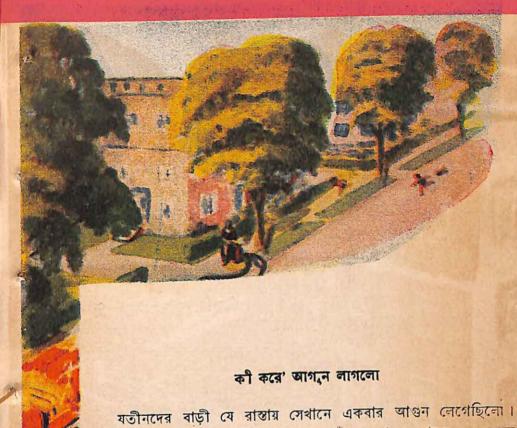
যতীনদের বাড়ী যে রাস্তায় সেখানে একবার আগুন লেগেছিলো। আগুন লেগেছিলো সোনালী মাছ রাখার কাঁচের গামলা থেকে। এরকম কী করে' হয় তা ভাবতে পারো? জলে ভর্তি গামলাটা রাখা হয়েছিলো জানালার পাশে। গামলায় দু'টো সোনালী মাছ ছিলো।

যখন আগুন লাগে তখন সে বাড়ীতে কেউ ছিলোনা। সবকটা জানালা-দরজাই বন্ধ ছিলো। দেশলাইগুলো নিরাপদ যায়গায় ছিলো, আর সারা বাড়ীতে আগুনও কোথাও জ্বলছিলো না।

রাস্তার ওপাশের একটা বাড়ী থেকে একজন লোক এবাড়ীর জানালার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে ধোঁয়া দেখতে পায়। সে দমকলে খবর দেয়, আর অমনি দমকলের লোকেরা ছুটে আসে। তাদের একজন জানালা ভেঙে জলের নল নিয়ে ঘরে ঢোকে। তারপর আগুন নেভাতে আর বেশী সময় লাগেনা। দমকলের লোকেরা জলের নলটা আবার গাড়ীতে চাপিয়ে ফিরে যাবার জন্য তৈরী হয়।

"কিন্তু আগুন লাগালো কে?" কে যেন জিজ্ঞাসা করে। "আমি তো জানি বাড়ীর মধ্যে কেউ ছিলোনা।"

"নিশ্চয়," দমকলের অফিসার বলেন, "সোনালী মাছের গামলাটা থেকেই আগুন লেগেছে। সেটা জানালার কাছে একখণ্ড কাগজের উপর রাখা ছিলো। গোল কাঁচের গামলাটা বিবর্ধক-কাচের মতো কাগজের উপর রোদ ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

"সূর্যের আলো কাগজের উপর একটা যায়গায় এসে মিলেছিলো। তাতে কাগজটা গরম হ'য়ে আগুন ধরে গিয়েছিলো।"

গুহাবাসী মানুষ কী করে আগুন সম্বন্ধে জানলো
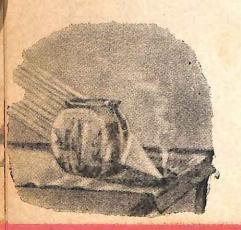
আদিমকালে মানুষ আগুন সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। তারা কাঁচা খাবার খেতো। তাদের যখন শীত করতো তখন তারা জানোয়ারের চামড়া দিয়ে পোষাক তৈরী করে পরতো। কখনো কখনো তারা ভেড়াদের মতো গাদাগাদি করে' থাকতো। কখনো কখনো তারা ঘুমোবার জন্য গুহা খুঁজে বের করতো।

একদিন একজন গুহাবাসী মানুষ শিকারের জন্য বনে গিয়েছিলো। এমন সময় আকাশে বিদ্যুৎ চমকে তার কাছেই একটা গাছের উপর বাজ পড়লো। এই গুহাবাসী লোকটা তার জীবনে এরকম কাণ্ড আর ঘটতে দেখেনি। সে দেখলো যে বাজ লেগে গাছের যে ডালটা ভেঙে

মাটিতে পড়ে গেছে সেটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। গুহাবাসী লোকটা ডালটা একটু ছুঁয়েই একেবারে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো। ডালটা গরম ছিলো বলে' তার আঙুল পুড়ে গিয়েছিলো।

গুহাবাসী মানুষটা তখন জোরে হাঁক দিলো। তার হাঁক শুনে আরও অনেক গুহাবাসী মানুষ দৌড়ে এলো। তারা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলন্ত ডালটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। তারা আরও ডাল পেড়ে জ্বলন্ত ডালটার উপর ধরলো। সেই ডালগুলোতেও আগুন ধরে' গেলো। এভাবেই মানুষ শিখলো কী ভাবে আগুন জ্বালিয়ে রাখা যায়।

গুহাবাসী মানুষরা অনেকদিন ধরে' আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখলো। রাতের বেলায় পালা করে তারা আগুনটার উপর নজর রাখতো। আগুনটা নিবুনিবু হয়ে এলে তারা আগুনের উপর আরও কাঠ চাপিয়ে দিতো।

তারপর হঠাৎ একদিন বৃষ্টি নামলো। আগুন বৃষ্টির জল পড়ে হিস্‌হিস্ শব্দ আর খুব ধোঁয়া হ'তে লাগলো। ওরা কয়েকটা জ্বলন্ত ডাল টেনে নিয়ে দৌড়ে গুহার মধ্যে চলে' গেলো। সেখানে আগুনটা কিছুক্ষণ জ্বললো, কিন্তু ভালো করে' জ্বললো না। অবশেষে আগুণটা নিভে গেলো। তখন ওদের পক্ষে আবার বাজ পড়ে আগুন জ্বলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিলোনা।

এভাবে অনেক বছর যাবার পর লোকে শিখলো আগুনকে একেবারে নিভতে না দিয়ে কী করে জ্বালিয়ে রাখা যায়।

আরও অনেক বছর যাবার পর তারা আগুন দিয়ে খাবার জিনিষ রান্না করতে শিখলো। আবার আরও অনেক অনেক বছর যাবার পর মানুষ শিখে ফেললো বৃষ্টিতে আগুন নিভে গেলে আবার নিজেরাই কি করে আগুন জ্বালিয়ে নেওয়া যায়।

ঘর্ষণ থেকে তাপ

একদিন যতীন জিজ্ঞাসা করে তার দাদা বীরেশকে: "দেশলাই হবার আগে মানুষ কী করে' আগুন ধরাতো?"

"তুমি যদি এই দড়িটা বেয়ে উঠো তবে আমি তোমাকে তা দেখিয়ে দেবো", বীরেশ বলে।

যতীন ঝোলানো দড়িটা বেয়ে উঠতে থাকে।

"আর উঠতে হবেনা" বীরেশ বলে। "এখন হাত দু'টো একটু ঢিল করে' পিছলে নামতে থাকো।"

"উঃ!" যতীন মাটিতে নেমেই চেঁচিয়ে উঠে।

"কী হয়েছে?" বীরেশ জিজ্ঞাসা করে।

"আমার হাত দু'টো পুড়ে গেছে," যতীন বলে।

"কী করে পুড়লো? দড়িটাতো গরম ছিলো না," বীরেশ বলে।

"আমার মনে হয় দড়ির ঘষায় আমার হাত দু'টো গরম হ'য়ে গেছে," যতীন বলে। "আচ্ছা ঘষতে ঘষতে কি কোন জিনিষ আগুন ধরে' যাবার মতো গরম হ'য়ে উঠতে পারে?"

বীরেশ তখন তার ধনুক আর ড্রিলটা বের করে দেখায়। সে যতীনকে সেটা ব্যবহার করতে শিখিয়ে দেয়। অনেক্ষণ খেঁটেখুঁটে যতীন ধনুক আর ড্রিলটা দিয়ে একটু আগুণ ধরায়।

বিদ্যুৎ থেকে তাপ

"আমি জানি তিনটে উপায়ে আমরা তাপ পেতে পারি," যতীন বলে: "সূর্য থেকে তাপ, জ্বলন্ত জিনিষ থেকে তাপ, আর জিনিষপত্র ঘষে তা থেকে তাপ।"

"একটা চতুর্থ উপায়ও আছে," পরেশ বলে। "রোজ সকাল বেলা খাবার সময় তুমি সেটা ব্যবহার করো। বলতো সেটা কী?"

"সকালবেলা ষ্টোভে আমাদের খাবার তৈরী করা হয়," যতীন বলে। ষ্টোভে গ্যাস জ্বলে, কাজেই তা-ও জ্বলন্ত জিনিষ, অর্থাৎ আমি যে তিনটে উপায়ের কথা বলেছি তার একটা।"

"আবার ভেবে দেখো,"

যতীন ভেবে ভেবে কিছুতেই ধরতে পারেনা। তখন পরেশ বলে: "টোষ্ট! সেটা কী করে হয়?"

"ওঃ, তুমি ইলেকট্রিক টোষ্টারের কথা বলছো," যতীন বলে। "সেটা কী করে কাজ করে তা জানো?"

"বোধহয় জানি," পরেশ বলে। "এসো কাল আমি যে পরীক্ষাটা করেছি তা তোমাকে দেখিয়ে দি'।"

পরেশের পরীক্ষা

পরেশের কাছে একটা 'ড্রাই সেল' আর কিছু সরু তামার তার ছিলো। তামার তারটা শাদা সুতো দিয়ে মোড়া ছিলো। সে আট থেকে দশ ইঞ্চির মতো তার কেটে নিয়ে তারের দু'ধার থেকে সুতো খুলে ফেললো তারপর সে তারের একটা ধার 'সেল'টার একদিকের পেতলের স্ক্রুর সঙ্গে জড়িয়ে দিলো, তারের অন্য দিকটাও অমনি 'সেলে'র অন্য দিকের পেতলের স্ক্রুর সঙ্গে জড়িয়ে দিলো।

যতীন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারের উপরের সুতো থেকে ধোঁয়া বের হতে লাগলো। তারটা খুব গরম হয়ে উঠলো। তখন পরেশ একটা কাঁচি নিয়ে তারটা কেটে দিলো। তখন তারটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

"তারটাকে কিসে গরম করে তুলেছিলো তা বলতে পারো?" পরেশ জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ," যতীন বলে, 'সেলে'র ভেতরকার বিদ্যুৎ।" বিদ্যুৎই টোষ্টারের তারগুলোকে গরম করে তোলে। আর সেই তাপে রুটি সেঁকা হয়।"

পরেশ বলে, "এখন আমরা তাপ পাবার তিনটে উপায় পেলাম : সূর্য থেকে তাপ, জ্বলন্ত জিনিস থেকে তাপ, জিনিসপত্র ঘষে তা থেকে তাপ, আর বিদ্যুৎ থেকে তাপ।"

কতোখানি গরম

একদিন রাত্রিবেলা তনুকা ছিলো মণিকাদের বাড়ীতে। ওদের দু'জনকে শোবার আগে গরম দুধ খেতে দেওয়া হয়েছিলো।

"গরম দুধ আমার বেশ লাগে," তনুকা বলে।

আমারও বেশ লাগে," মণিকা বলে। "আমার দুধটা তোমার দুধের চেয়ে গরম।"

কোনটা বেশী গরম তা তুমি কী করে জানবে?" তনুকা জিজ্ঞাসা করে।

"কেন? দু'টো গেলাসে আঙুল ডুবিয়েই জানা যাবে কোনটা বেশী গরম," মণিকা বলে।

মণিকার দিদি এতোক্ষণ চুপ করে' শুনছিলো ওদের কথা। সে ভাবলো ওদের নিয়ে একটু মজা করা যাক। তাই সে বললো: "ওভাবে দু'টো গেলাসে আঙুল ডুবিয়েও তুমি বলতে পারবে না কোন গেলাসের দুধ বেশী গরম। তার চেয়ে, ঘুমুতে যাবার আগে একটা পরীক্ষা করে' দেখতে রাজী আছো?"

"নিশ্চয়!" মণিকা আর তনুকা দু'জনে একসঙ্গে বলে' উঠে।

মণিকার দিদি তিনটে গামলা এনে টেবিলের উপর রেখে দেয়। একটা গামলায় সে গরম জল ঢেলে দেয়। দ্বিতীয় গামলাটায় সে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়, আর তৃতীয় গামলাটায় সে যে জল ঢেলে দেয় তা গরমও নয় ঠাণ্ডাও নয়। সে তারপর তনুকাকে বলে তার বাঁ হাতটা ঠাণ্ডা জলে রাখতে আর ডান হাতটা গরম জলে। সে তনুকাকে তার হাত দু'টো দু'মিনিট এভাবে রাখতে বলে।

দু'মিনিট উতরে যাবার পর সে বলে, "এবারে তোমার বাঁ হাতটা তৃতীয় গামলাটাতে রাখো। বলতো এ গামলাটার জল গরম না ঠাণ্ডা?"

"গরম!" তনুকা তক্ষুণি চেঁচিয়ে বলে।

"আচ্ছা, এবারে তোমার ডান হাতটা তৃতীয় গামলাটায় রাখো।"

তনুকা তাই করে। তার মুখ দেখে' মনে হয় সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে।

"বা: রে!" সে বলে। "এই জলটাই আমার বাঁ হাতে গরম লাগছিলো, এখন ডান হাতে ঠাণ্ডা লাগছে! আমি বুঝতে পারছি না জলটা আসলে গরম না ঠাণ্ডা।"

মণিকাও করে' দেখে পরীক্ষাটা। ব্যাপারটা খুব মজার মনে হয় ওদের কাছে। ওরা কেউই বলতে পারে না তৃতীয় গামলার জলটা সত্যি গরম না ঠাণ্ডা।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে মণিকা আর তনুকা সবাইকে বলে এই পরীক্ষার কথা। অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও পরীক্ষাটা করে' দেখে।

থার্মোমিটার কী করে' কাজ করে

"আমার দাদা আমাকে একটা বেশ মজার পরীক্ষা দেখিয়ে দিয়েছেন," বীরু বলে। "একবার করে' দেখবে সেটা?"

"হ্যাঁ, সেটা যদি আমাদের পরীক্ষাটার মতো মজার হয়," তনুকা বলে।

"আমার মনে হয় তার চেয়েও মজার," বীরু বলে।

বীরু একটা বোতল রঙিন জল ভরে নেয়, আর বোতলটার মুখে একটা কাঁচের নলশুদ্ধ ছিপি এঁটে দেয়। বীরু বোতলটাকে গরম করতেই খানিকটা রঙিন জল কাঁচের নলের মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে থাকে।
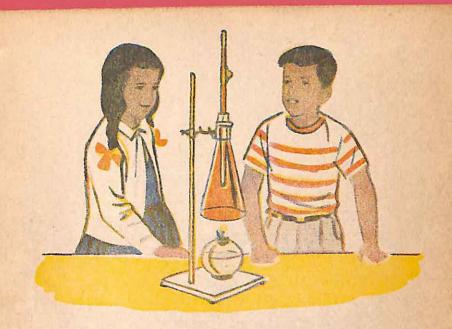
"ওঃ, আমি বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা," তনুকা বলে। "জল গরম হ'লে ফুলে' উঠে, আর ফুলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তা নলের মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে থাকে।"

"হ্যাঁ, ঠিক থার্মোমিটারের মতো," মণিকা বলে। জল যখন গরম হয় তখন নলের ভেতর দিয়ে উপরে উঠতে থাকে।"

"থার্মোমিটারের মতো নয়, থার্মোমিটারই বলো," বীরু বলে। "জল যখন ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে তখন আবার নীচে নেমে যাবে।"

তাপ কী করে' এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়

একটা মোমবাতি জ্বালাও। মোমবাতির শিখার কাছে তোমার একটা হাত রাখো। হাতটাকে আরও কাছে নাও। এবারে হাতটাকে একটু দূরে সরিয়ে নাও। কী বুঝলে?

সূর্য পৃথিবী থেকে ৯০ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে যেমন করে তাপ আসে মোমবাতি থেকেও ঠিক তেমনি করেই তাপ আসে। তাপ সরল রেখা ধরে' আসে।

ভেবে দেখো তো মোমবাতি থেকে সূর্য কতো বেশী গরম!

এখন আবার তোমার হাতটা মোমবাতির শিখার কাছে রাখো। এক টুকরা পিজবোর্ড তোমার হাত আর মোমবাতির শিখার মাঝখানে রাখো। তাপ কি পিজবোর্ডের টুকরাটাকে ঘুরে' আসছে? বলতো ছায়ার চেয়ে রোদে গরম বেশী কেন?
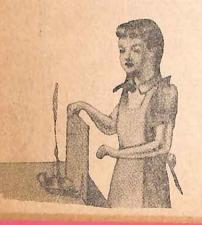
মোমবাতির শিখার উপর তোমার হাতটা রাখো। আগের বার শিখার যতো কাছে হাতটা রাখতে পেরেছিলে এবার কি ততো কাছে রাখতে পারছো? মোমবাতির উপরের হাওয়া উপরদিকে উঠছে বলে মনে হচ্ছে না? কাগজ কেটে খুব ছোট্ট একটা চাকতি তৈরি করে নাও, তারপর চাকতিটাকে মোমবাতির উপর ধরো। এতে কি বোঝা যাচ্ছে যে হাওয়া তাপকে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? কাগজের চাকতিটাকে গরম রেডিয়েটারের উপর ধরে কী হচ্চে?

মোমবাতির শিখায় এক টুকরা তামার তার ধরো। তাপ কি তারটা বেয়ে আসছে? কাঠ, কাঁচ ইত্যাদি আরও নানারকম জিনিস মোমবাতির শিখায় ধরে' দেখো। কোন কোন জিনিস কি অন্যান্য জিনিসের চেয়ে ভালো ভাবে তাপ বয়ে' নিয়ে যায় না?

এরকম পরীক্ষা করে' দেখার পর তুমি কি যে তিন উপায়ে তাপ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় সেগুলোর নাম বলতে পারো?

কাগজের চাকতিটার
উপর দাগ বরাবর কাটো

সুতো পরাবার
জন্য ছেঁদা

জামাকাপড় ও তাপ

আমাদের শরীরের ভেতরটা সব সময়ই গরম থাকে। ডাক্তার থার্মোমিটার ব্যবহার করে দেখেন আমাদের শরীরের তাপ কতোখানি।

আমাদের চারধারের হাওয়া যখন ঠাণ্ডা হয় তখন আমাদের গায়ের চামড়াও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন আমরা শরীরের তাপ সমান রাখবার জন্য বেশী জামাকাপড় পরি।

শুকনো হাওয়ার চেয়ে ভিজে হাওয়ায় আমাদের বেশী গরম লাগে। ঘরে 'হিটার' চালালে অনেক সময় ঘরের হাওয়া খুব শুকনো হয়ে যায়। তখন আমাদের ঠাণ্ডা বোধ হয় যদিও থার্মোমিটারে গরমই বলবে। হাওয়া যদি যথেষ্ট ভিজে থাকে তবে ৬৮ ডিগ্রী তাপে আমাদের সবচেয়ে বেশী আরাম বোধ হবে।
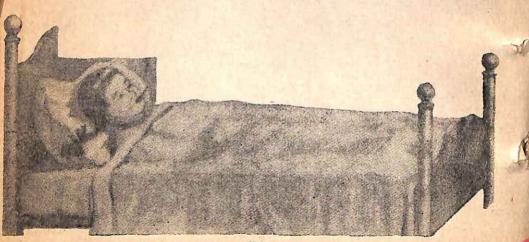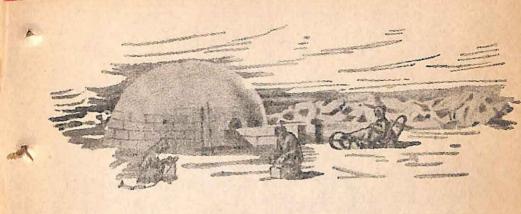
ঘরের বাইরে যখন ঠাণ্ডা পড়ে তখন আমরা শরীরের তাপ রক্ষা করার জন্য গরম জামাকাপড় পরি। ঘরের ভেতরে এলে বেশী জামাকাপড়ের দরকার হয় না। খুব বেশী জামাকাপড় বা খুব কম জামাকাপড় থেকে সর্দি লাগতে পারে।

প্রশ্ন

(১) ছায়ার চেয়ে রোদে গরম বেশী কেন?
(২) আমাদের থার্মোমিটারের দরকার হয় কেন?
(৩) বিবর্ধক কাঁচ কী ভাবে কাজ করে?
(৪) থার্মোমিটার কী ভাবে কাজ করে?
(৫) দেশলাই ছাড়াও কী ভাবে আগুন ধরানো যায়?
(৬) জামাকাপড় কী ভাবে আমাদের গরম রাখে?

যা করতে হবে

(১) থার্মোমিটার দেখতে শেখো।

(২) থার্মোমিটার তৈরি করো।

(৩) এক সপ্তাহ ধরে' রোজ মেপে দেখো তোমাদের স্কুল ঘরের ভেতরের হাওয়া কতোখানি গরম থাকে।

(৪) এক সপ্তাহ ধরে' মেপে দেখো বাইরের হাওয়া কতোখানি গরম থাকে।

(৫) দেখো তো বাইরের হাওয়া দিনের বেলা বেশী গরম না বেশী ঠাণ্ডা হয়। এক সপ্তাহ ধরে একটা চাটের উপর টুকে রাখো।

(৬) নানারকম থার্মোমিটারের ছবি যোগাড় করো। কোন্ রকম কি কাজে ব্যবহার করা হয় বলো।

(৭) পরীক্ষায় যে বোতল-থার্মোমিটারের কথা বলা হয়েছে সেরকম একটা থার্মোমিটারের দু'পাশে তোমার দু'টো হাত চেপে ধরো। দেখোতো তোমার হাতের তাপে জল কাচের নলটা বেয়ে উপরে উঠে কিনা।

আরও যা করতে হবে
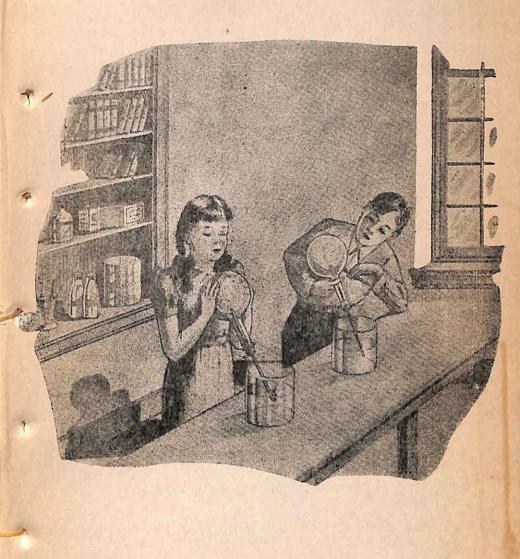
নকল করে' খালি জায়গাগুলো পূরণ করো

(১) তাপ .... রেখায় চলে।
(২) জ্বলন্ত মোমবাতির উপরকার হাওয়া .... দিকে যায়।
(৩) .... ব্যবহার করে' আমরা বলতে পারি হাওয়া কতো-খানি গরম।
(৪) হাওয়া যখন গরম হয় তখন থার্মোমিটারের তরল পদার্থ .... দিকে যায়।
(৫) হাওয়া যখন ঠাণ্ডা হয় তখন থার্মোমিটারের তরল পদার্থ .... দিকে যায়।
(৬) ঘরের মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশী আরাম বোধ করি যখন তাপ প্রায় .... ডিগ্রী থাকে।

যে চার উপায়ে আমরা তাপ পেতে পারি সেগুলো হ'লো :

(১) ....
(২) ....
(৩) ....
(৪) ....

যে দু'কাজে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তা হ'লো :

(১) ....
(২) ....

কাজ সহজ করা

বাড়ী সরানো

একদিন যতীন আর তনুকা ওদের বাবার সঙ্গে বিকেল বেলা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলো। সিনেমার ছবিতে ওরা দেখতে পেলো যে একটা বাড়ীর কাছে অনেক লোকের ভিড় আর হট্টগোল। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ওরা যখন ওদের বাবাকে জিজ্ঞাসা করে' জানতে পারলো যে এই গোটা বাড়ীটাকে পঞ্চাশ ফুট দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে তখন ওরা দু'জনেই অবাক হয়ে যায়।

তনুকা বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে' যতীনের পানে তাকায় সে ভাবে গোটা বাড়ীটাকে কী করে সরানো যায়?
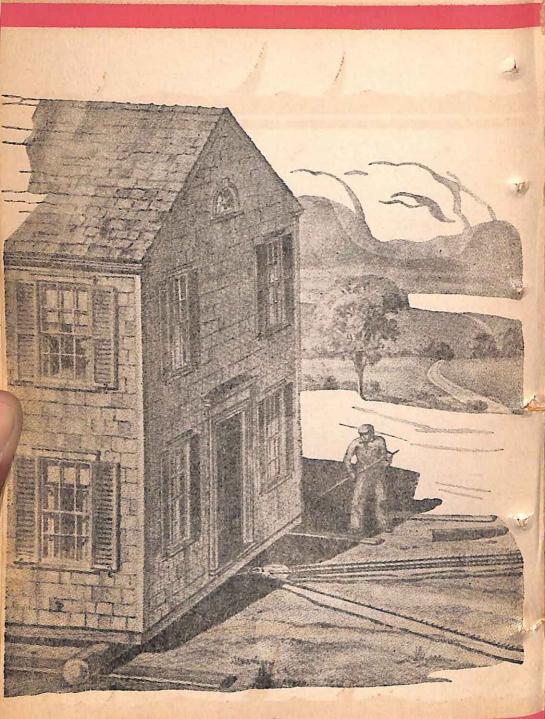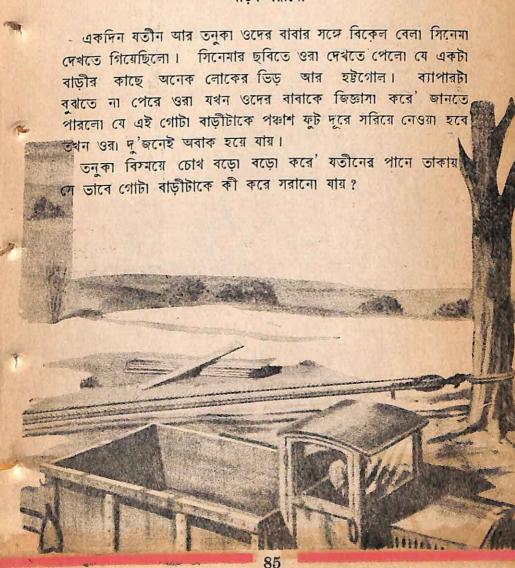
দেখতে দেখতে ছবির লোকগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রথমে তারা মাটি খুঁড়তে লাগলো যতক্ষণ না যে চার সার পাথরের উপর দাঁড়িয়েছিলো সেগুলো বেরিয়ে পড়লো। পাথরগুলোর উপর বিরাট কড়িকাঠ পাতা ছিলো। লোকগুলো প্রত্যেক কড়িকাঠের নীচে একটা করে 'জ্যাক' কল বসিয়ে দিলো। তারপর প্রত্যেকটা 'জ্যাক' কলের মধ্যে একটা করে লোহার ডাণ্ডা ঢুকিয়ে তারা সেগুলিকে ঘোরাতে লাগলো, আর একটু একটু করে' বাড়ীটা উপরের দিকে উঠতে লাগলো।

তারপর কড়িকাঠগুলোর নীচের পাথরগুলো যখন সরিয়ে নেওয়া হলো তখন বাড়ীটা শুধু 'জ্যাক' কলগুলোর উপর ভর করে' দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর সেই লোকগুলো বাড়ীটার নীচে আরও কতগুলো কড়িকাঠ গুজে দিলো। এই নতুন কড়িকাঠগুলোর নীচে লাগানো ছিলো ইস্পাতের রোলার। শীগ্গিরই তারা 'জ্যাক' কলগুলোকে অন্যদিকে ঘোরাতে লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটা নীচের দিকে নামতে শুরু করলো। অবশেষে বাড়ীটা রোলার লাগানো কড়িকাঠগুলোর উপর বসে গেলো।
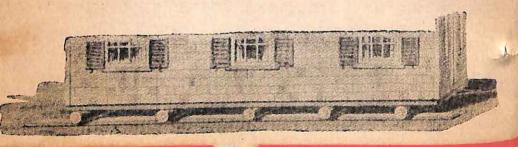
হঠাৎ সিনেমা হলের আলোগুলো জ্বলে উঠলো। 'ইণ্টারভ্যাল' শুরু হতেই যতীন আর তনুকার বাবা ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে আসেন। ওরা তাঁকে এইমাত্র ছবিতে যা দেখলো সে সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করে।

যন্ত্র সম্পর্কে নানা কথা

"জ্যাক'কল দিয়ে ভারী জিনিস তোলা এত সহজ কেন? 'জ্যাক' কল দিয়ে কতো ভারী জিনিস তোলা যায়? 'জ্যাক'কল কী করে' তৈরি করে?" যতীন জিজ্ঞাসা করে।

"'জ্যাক''কল ঘোরাতে হলে বুঝি গায়ে খুব জোর থাকা চাই? ওরা বাড়ীটার নীচে রোলার বসিয়ে দিলো কেন?" তনুকাও জানতে চায়।

একটু থামো!" ওদের বাবা বলে উঠেন, "একবারে একটা করে প্রশ্ন করো! তাছাড়া, ছবির লোকগুলো কী করছে তা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখো তাহলে তোমরা নিজেরাই বেশীর ভাগ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।

"তবে একটু আমি তোমাদেরকে বলে' দিচ্ছি। 'জ্যাক'কলের পুরো নাম হলো 'জ্যাক-স্ক্রু', কেননা সেটার মধ্যে একটা স্ক্রু আছে। লোকগুলো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সেই 'স্ক্রু'টাকেই ঘোরাচ্ছিলো। 'জ্যাক-স্ক্রু'টা ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে কড়িকাঠটাকে ঠেলে তুলছিলো। কারণ 'জ্যাক-স্ক্রু' হলো সেই ধরনের যন্ত্র যা ছোট ছোট ঠেলাকে বিরাট বড়ো ঠেলা দিয়ে তুলতে পারে।

যতীন আর তনুকার আরও প্রশ্ন করবার ছিলো, কিন্তু তক্ষুণি 'হলে'র আলোগুলো নিভে গেলো। সিনেমা আবার শুরু হবার আগেই ওরা ছুটে 'হলে' ফিরে গেলো এবারে কী হয় তা দেখতে।

আরও যন্ত্রপাতি

দেখা গেলো বাড়ীটা এখনো সেই রোলারগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলো বাড়ীটার একধারে কতগুলো কপিকল লাগিয়ে দিলো। কাছের একটা গাছেও কতগুলো কপিকল লাগিয়ে দেওয়া হলো। সবগুলো কপিকলের মধ্যদিয়েই একটা দড়ি পরিয়ে দেওয়া হলো। দড়ির অপর দিকটা একটা লরির পিছনে বেঁধে দেওয়া হলো।
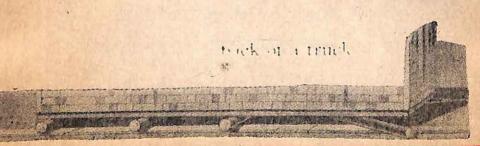
"সব ঠিক!" একজন লোক একথা চেঁচিয়ে বলতেই লরিটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো। দেখা গেলো বাড়ীটাও চলতে শুরু করেছে। বাড়ীটার নীচে রোলারগুলো চাকার মতো ঘুরছে আস্তে আস্তে। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ীটা ছয় ফুট সরে গেলো।

হঠাৎ বিষম শব্দ হলো। বাড়ীটার নীচে থেকে একটা রোলার হড়্‌কে বেরিয়ে এসেছে। এবারে লোকগুলো কী করবে? বাড়ীটাকে তো আর জমির উপর দিয়ে হিচঁড়ে টেনে নেওয়া যায় না। তাছাড়া বাড়ীটার নীচে 'জ্যাক'কল বসাবার মতো যথেষ্ট জায়গাও নেই এখন।

ওদের মধ্য থেকে একজন লোক একটু খুব ভারী ইস্পাতের ডাণ্ডা নিয়ে এলো। সে ডাণ্ডাটার একটা দিক বাড়ীটার নীচে ঢুকিয়ে দিলো, আর ডাণ্ডাটার নীচে একটা কাঠের গুঁড়ি রেখে দিলো।
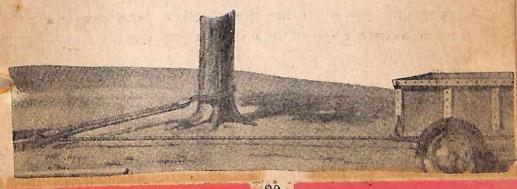
তারপর সে ডাণ্ডাটার অন্য ধারটা খুব কষে টানতে লাগলো। বাড়ীটা একটুখানি উপরে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য লোকেরা বেরিয়ে আসা রোলারটাকে আবার বাড়ীটার নীচে ঢুকিয়ে দিলো।

এরপরে আর কোন গণ্ডগোল হলোনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ীটা আগের যায়গা থেকে পঞ্চাশ ফুট দূর নতুন যায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। তখন বাড়ীটাকে আবার 'জ্যাক'কলের সাহায্যে তুলে তার নীচে থেকে রোলারগুলো বের করে নেওয়া হলো। তারপর 'জ্যাক'কলগুলোকে আবার অন্যদিকে ঘুরিয়ে বাড়ীটাকে মাটিতে বসানো হলো।

যতীন আর তনুকা বাড়ীতে এসে আরও অনেক প্রশ্ন করলো ওদের বাবাকে। যতীন জানতে চাইলো, "বাড়ীটাকে সরাবার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছিলো সেগুলো আবিষ্কার করেছিলো কে?"

"তা কেউ জানেনা," ওদের বাবা বললেন। "আজ ছবিতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি দেখলে সেগুলো সবই আবিষ্কার করা হয়েছে অ-নে-ক যুগ আগে। মানুষ বাড়ীঘর তৈরী করবার বা লিখতে শেখবার অনেক আগেই ওগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে।"

লিভার

তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে বাড়ীটার একটা কোণ তোলবার জন্য ইস্পাতের ডাণ্ডা ব্যবহার করা হয়েছিলো। ঐধরনের যন্ত্রকে বলা হয় 'লিভার'। যে কোন লাঠি বা ডাণ্ডা আমরা কোন কাজ তাড়াতাড়ি বা সহজে করবার জন্য ব্যবহার করি তাকেই বলা হয় 'লিভার' গুহাবাসী মানুষরা হাজার হাজার বছর আগেও 'লিভার' ব্যবহার করতো।
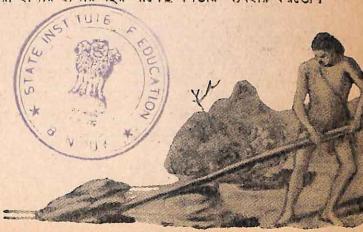
"ক্রীকেট খেলার ব্যাটকেও কি লিভার বলা চলে?" যতীন জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ," ওর বাবা বলেন।

"তা হলে আমি প্রায় একশো'টা জিনিষের নাম বলতে পারি যেগুলো সবই লিভার," যতীন সগর্বে বলে।
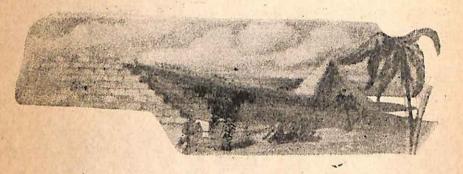
চাকা

"রোলারের ব্যবহারও অনেক যুগ থেকে চলে আসছে," ওদের বাবা বলতে থাকেন। সেকালের মানুষ ভারী পাথর এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় নেবার জন্য লিভার ব্যবহার করতো। ছবিতে বাড়ীটাকে যেভাবে সরানো হয়েছিলো ঠিক তেমনি ভাবেই ভারী পাথর সরানো হতো। পাথরগুলোকে টেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে রোলারগুলো তার নীচ থেকে বেরিয়ে আসতো। তখন রোলারগুলোকে সামনে নিয়ে আবার পাথরের নীচে বসিয়ে দিতে হতো।

আনত তল

"ও:, আনত তল কাকে বলে তা আমার জানা আছে," যতীন বলে। "একদিন আমি কয়েকজন লোককে ওরকম একটা জিনিষ ব্যবহার করে একটা লরীতে কতগুলো পিপে তুলতে দেখেছিলাম। পিপেগুলো এতো ভারী ছিলো যে হাত দিয়ে টেনে তোলা যাচ্ছিলো না। তাই তারা পিপেগুলোকে একটা তক্তার উপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে উপরে তুলেছিলো। এটা বেশ সহজ ছিলো।"

"আনত তলের একটা উদাহরণ আমারও জানা আছে," তনুকা বলে। "সেটা হ'লো পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে হিচঁড়ে নীচে নামা। সেটাও বেশ সহজ কাজ।"

"অন্য যন্ত্রটা কী?" যতীন জিজ্ঞাসা করে। অন্য কী যন্ত্র হ'তে পারে আমি তো বুঝতে পারছিনা।"

স্ক্রু

"তুমি যদি একটা লাঠির চারধারে একটুকরা দড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে নাও তবে সেটা 'স্ক্রু'র মতো দেখাবে। এভাবেই হয়তো যে মানুষটি প্রথম 'স্ক্রু' তৈরী করেছিলো তার মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিলো। 'স্ক্রু' মানুষের অনেক কাজে লাগে। সেগুলো বেশীর ভাগই ব্যবহার করা হয় জিনিষপত্র উপরে তোলবার জন্য আর এক জিনিষের সঙ্গে অন্য জিনিষ জুড়ে দেবার জন্য।"

"আরও কোনরকম যন্ত্র আছে নাকি?" তনুকা জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ," ওদের বাবা বলেন। "আরও দু'রকম যন্ত্র আছে। তার একটাকে বলে আনত তল। যে কোন চেপ্টা তক্তা যার একটা দিক অন্য দিকটার চেয়ে বেশী উচু তাকেই আনত তল বলা চলে।"
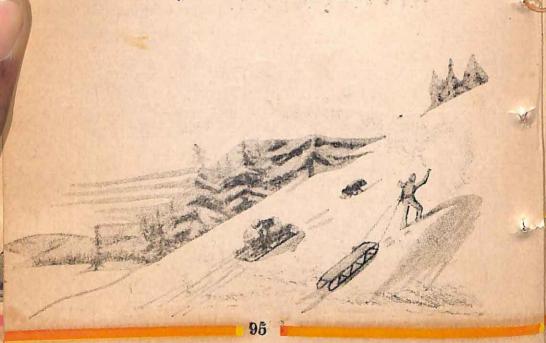
কপিকল

"কপিকল খুব সম্ভব চাকার পরেই আবিষ্কার করা হয়েছে," যতীনের বাবা বলতে থাকেন। "কপিকল আসলে হ'লো চাকা আর ধুরা, কিন্তু ওটাকে আমরা অন্যভাবে ব্যবহার করি।

"তোমাদের স্কুলবাড়ীটায় যে পতাকাদণ্ড আছে তার উপরেও একটা ছোট কপিকল আছে। পতাকার সঙ্গে যে দড়িটা আটকানো থাকে সেটা সেই ছোট কপিকলটার মধ্য দিয়ে যায়। দড়ি আর কপিকলটা ব্যবহার করেই পতাকাটাকে উঠানো বা নামানো যায়।

"কপিকল আবিষ্কার হবার আগে লোকে পতাকা উঠাতো কিনা তা আমার জানা নেই। তবে এটা বলা যায় যে কপিকল আবিষ্কারের আগে পতাকা উঠানো বা নামানোর জন্য লোকদেরকে পতাকাদণ্ড বেয়ে উঠতে ও নামতে হতো, আর সেটা মোটেই আরামের কাজ ছিলো না।

"হয়তো এইজন্যই কেউ মাথা খাটিয়ে কপিকলের আবিষ্কার করে' থাকবে।"
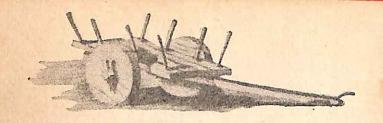
"সে তো খুব পরিশ্রমের ব্যাপার," যতীন বলে।

"হ্যাঁ," ওদের বাবা বলেন, "সেই জন্যই বোধহয় চাকা আবিষ্কার করা হয়েছিলো। সেযুগে কেউ হয়তো রোলারে করে পাথর সরাতে সরাতে হয়রান হয়ে পাথর সরাবার আরো সহজ উপায় বের করতে চেষ্টা করেছিলো। সে হয়তো ভেবেছিলো: রোলারের মধ্যে একটা ধুরা লাগিয়ে চাকা বানিয়ে নিলে কেমন হয়?'

"সে যাই হোক, চাকা কিন্তু অনেক কাল ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রথম প্রথম মানুষ ভালো চাকা তৈরী করতে পারতোনা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভালো চাকা তৈরী করার উপায়ও বের করা হ'লো।

গোঁজ

"মনে পড়ে সেবার ঝড়ের পরে গাছটা কাটিয়ে ফেলার কথা ?" ওদের বাবা জিজ্ঞাসা করেন। "আমরা চাইনি যে গাছটা আমাদের বাড়ীর উপর পড়ুক। তাই আমরা গাছটাকে অন্যদিকে ঠেলে দেবার জন্য একটা ছোট যন্ত্র ব্যবহার করেছিলাম।"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমরা সেটাকে গোঁজ বলতাম," তনুকা বলে।

"হ্যাঁ," ওদের বাবা বলেন। "গোঁজ আরও অনেক রকম ভাবে ব্যবহার করা যায়। এখন তোমরা যতোরকম যন্ত্র আছে সেগুলো সবই জেনে গেলে। সবচেয়ে প্রকাণ্ড কলকব্জাও কিন্তু এই ছয়রকম যন্ত্র দিয়েই তৈরী হয়।"

"এমনকি বাষ্প চালিত বেলচাও?" যতীন জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ," ওদের বাবা বলেন, "বাষ্পের বেলচাও।"

যা করতে হবে

(১) লিভার ব্যবহার করে কোন ভারী জিনিষ তোলো। লিভারটা নানারকম ভাবে ব্যবহার করো।

(২) একখানা তক্তাকে লিভার হিসেবে ব্যবহার করে' ক্লাশের সবচেয়ে মোটা ছেলেটিকে তুলতে চেষ্টা করো। একই উপায়ে একগাদা বই তোলবার চেষ্টা করো।

(৩) আমরা খেলার সময় কতোরকমের লিভার ব্যবহার করি তার একটা তালিকা তৈরী করো।

(৪) দড়ি টেনে কপিকলের সাহায্যে কোন ভারী জিনিষ তোলবার চেষ্টা করো।

(৫) কাঠের চাকা দিয়ে একটা গাড়ী তৈরী করো। কোন গাছের গুঁড়ির একটা ধার করাত দিয়ে কেটে চাকা বানিয়ে নাও। ধুরা লাগাবার জন্য চাকার মাঝখানে ছেঁদা করে নাও।

(৬) প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মালটানা গাড়ীর ছবি যোগার করো।

(৭) মেশানো সেট দিয়ে নানারকম জিনিষ তৈরী করো যাতে লিভার ও চাকা ব্যবহার করা যায়।

যে সব জীবজন্তু কাজ করে

এদেশে কাজকর্মের জন্য অন্যান্য জীবজন্তর চেয়ে বলদই বেশী ব্যবহার করা হয়। বলদ গাড়ী টানে, বোঝা বয় আর চাষবাসেরও অনেক কাজ করে।

পৃথিবীর কোন কোন অংশ এতো ঠাণ্ডা যে সেখানে বলদ বাঁচতে পারেনা। কোন কোন যায়গা আবার এতো গরম যে সেখানে বলদ কাজ করতে পারে না। অন্য অনেক যায়গা হয় খুব বেশী শুকনো, নয়তো খুব বেশী ভিজে। তাই সেসব যায়গায় কাজকর্মের জন্য অন্য জীবজন্ত ব্যবহার করা হয়।

অনেক সময় জীবজন্তুদেরকে খুব পরিশ্রম করতে হয়। তাই এই সব অবোলা বন্ধুদের সম্পর্কে আমাদের বেশ যত্ন নেওয়া উচিত। তাদেরকে বেশ ভালো করে’ খেতে দেওয়া উচিত। তাদের যখন তৃষ্ণা পায় তখন তাদেরকে নির্মল জল খেতে দেওয়া উচিত। তাদের ঘুমোবার জন্য ভালো যায়গার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ, ঠিক আমাদেরই মতো জীবজন্তুরাও ক্লান্ত হয় এবং তাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা পায়।

কাজ কাকে বলে

একদিন দারুণ ঝড় এলো। এতো জোরে ঝড় এলো যে গাছের বড়ো বড়ো ডাল ভেঙে পড়লো, গোটাকয়েক গাছ শিকড় উপড়ে মাটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এমনকি গোটাকয়েক বাড়ী আর গোলা-ঘরও ভেঙে পড়ে গেলো।
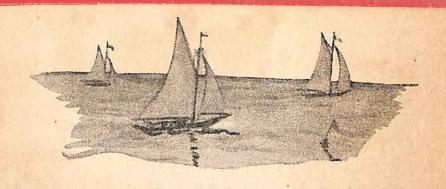
"এতো সব কাণ্ড করবার জন্য ঝড়কে নিশ্চয় খুব জোরসে কাজ করতে হয়েছে," পরেশ বলে। "ভেবে দেখোতো কতো জোরে ঠেলা মারতে হয়েছে তাকে।"

"এরকম গাছপালা, ঘরবাড়ী ভেঙে ফেলাকে আমি মোটেই কাজ বলিনে," যতীন বলে। "এ শুধু অন্যের কাজ বাড়ানো।"

"এটা কাজ নয় কেন?" পরেশ জিজ্ঞাসা করে। "এটা উপকারী কাজ না হতে পারে কিন্তু কাজতো বটে। এতো সব কাণ্ড করবার জন্য যথেষ্ট শক্তি খাটাতে হয়েছে। আর, যখন শক্তি খাটিয়ে কোন জিনিষকে এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় নেওয়া হয় তাকেই বলে কাজ।"

হাওয়াকে কাজে লাগানো

"মনে হয় তুমি ঠিক কথাই বলেছো," যতীন বলে। কিন্তু সময় সময় হাওয়াকে এমন কাজে লাগানো যায় যাতে মানুষের উপকার হয়। যেমন, ধরো, পালে হাওয়া লাগিয়ে জলের উপর দিয়ে যখন নৌকো চালানো হয় তখন হাওয়া বেশ কাজের মতো কাজ করে।

"পৃথিবীর কোন কোন যায়গায় প্রায় সব সময়েই জোরে হাওয়া বয়। সেখানে হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে তা দিয়ে কল ঘোরানো যায়। সেই হাওয়া কলে জল পাম্প করা যায়, গম পেষা যায়, আরও অনেক দরকারী কাজ পাওয়া যায়।

"একটা হাওয়া-কল তৈরী করলে কিন্তু বেশ মজা হয়," পরেশ বলে। "এসো না আমরা কাজ করার মতো যথেষ্ট বড়ো করে একটা হাওয়া-কল তৈরী করি।"

"বেশ," যতীন বলে। "কাল তো রবিবার কাল হয়তো বাবা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।"
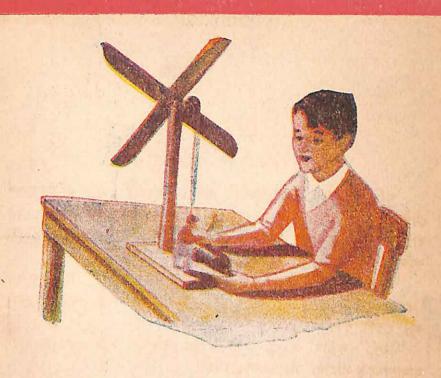
জলের স্রোতকে কাজে লাগানো

হাওয়া-কলটা তৈরী হ'য়ে যাবার পর যতীন আর পরেশের বন্ধুরা সেটা দেখতে আসে। তারা লক্ষ্য করে' দেখে যে একটা কলের-পুতুল হাওয়া-কলটায় কাজ করছে।

"তোমাদের হাওয়া-কলটা দেখে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে," প্রদীপ বলে। "চলন্ত হাওয়া যদি কাজ করতে পারে তবে জলের স্রোত কেন তা পারবে না ?"

প্রদীপ তার বাবাকে বলে কথাটা, আর ঠিক তার পরের রবিবারের দুপুরবেলা তারা দু'জনে মিলে একটা যন্ত্র তৈরী করে' ফেলে। তখন প্রদীপের বন্ধুরা দেখতে আসে ওর যন্ত্রটা কেমন করে কাজ করে।

"আমার যন্ত্রটা এভাবে কাজ করে," প্রদীপ ওদেরকে বুঝিয়ে দেয়। "চৌবাচ্চার নল বেয়ে জল এসে চ্যাপটা দাঁড়ওয়ালা চাকাটার উপর ঘা মেরে সেটাকে ঘুরিয়ে দেয়। চাকাটা ঘুরবার সঙ্গে সূতোটা জড়িয়ে যায় আর বাটখারাটা উপরে উঠে যায়।"
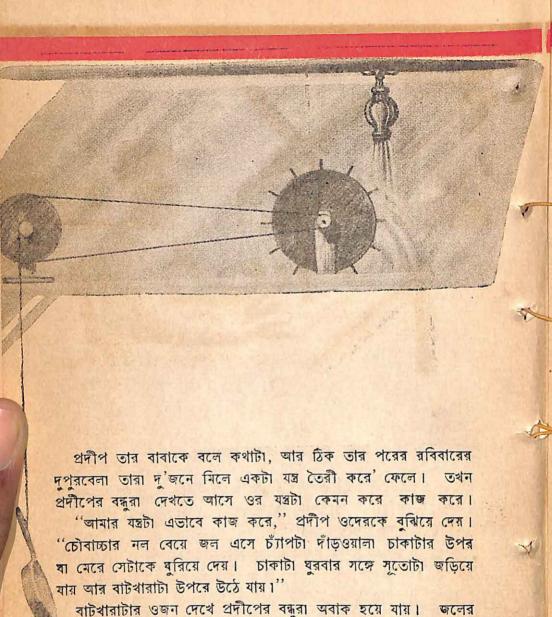
বাটখারাটার ওজন দেখে প্রদীপের বন্ধুরা অবাক হয়ে যায়। জলের স্রোত চলন্ত হাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করে যে।

প্রদীপের বাবা তখন ওদেরকে দেখান কলকারখানায় যেসব ধরণের জল-চাকা ব্যবহার করা হয় সেগুলোর ছবি। জল-চাকা শতশত লোকের কাজ করতে পারে। পৃথিবীর কোন কোন অংশে কলকারখানাগুলিতে যে শক্তি ব্যবহার করা হয় তার বেশীর ভাগই আসে জল-চাকা থেকে। সেই শক্তি অনেক সময় বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হয়। তখন সেই বিদ্যুৎকে তারের মধ্য দিয়ে যেখানে স্রোতের সাহায্যে চাকা ঘোরানো হয় সেখান থেকে অনেক দূরের বাড়ীঘর ও কলকারখানায় পাঠানো চলে।
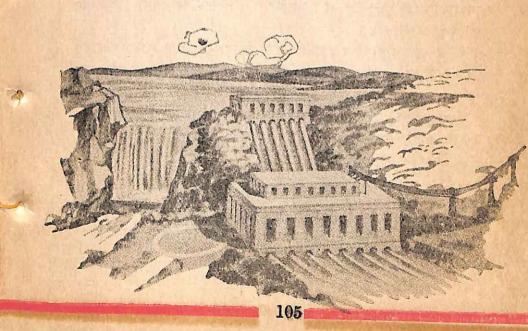
তাপের সাহায্যে কাজ করা

তনুকা একদিন একটা রেলগাড়ীকে ষ্টেশনে থেকে রওনা হতে দেখলো। এঞ্জিনটা হুপ্ হুপ্ শব্দ করতে করতে এগোচ্ছিলো, আর সঙ্গে সঙ্গে মেঘের মতো ধোঁয়া ছাড়ছিলো বাতাসে। এঞ্জিনটা যখন তনুকার পাশ দিয়ে চলে' গেলো তখন সে দেখলো যে ফ্যায়ারম্যান এঞ্জিনের চুল্লীটার মধ্যে বেলচা করে' কয়লা দিচ্ছে। খোলা চুল্লীটা থেকে আগুনের হলকা এসে যেন তনুকার মুখে লাগে। শীগ্গিরই রেলগাড়ীটা হাওয়ার বেগে ছুটতে লাগলো।

"আমি যতোরকম কল দেখেছি এটা হ'লো সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো," তনুকা বলে। "আমরা যতোরকম কলের কথা জানি এটা সেগুলির চেয়ে বেশী কাজ করে।"

"আমার মনে হয় তাপের সাহায্যে কাজ করাই সবচেয়ে ভালো উপায়," যতীন বলে।

বিদ্যুতের সাহায্যে কাজ করা

"তাপের সাহায্যে কাজ করাই তোমার সবচেয়ে ভালো মনে হয় কেন ?" তনুকা জিজ্ঞাসা করে।

"কখনো কখনো হাওয়া থেমে যায়," যতীন বলে। "আবার কখনো কখনো জল-চাকা চালাবার মতো যথেষ্ট জল থাকে না। তাপ ব্যবহার করে কিন্তু সবসময়েই কাজ করা যায়।"

"তা হ'লেও তাপকেই সবচেয়ে ভালো উপায় বলা যায় না," তনুকা বলে। "আমার মনে হয়না যে মা কখনো বাড়ীতে বাষ্পের এঞ্জিন ব্যবহার করতে রাজী হবেন। তিনি বিদ্যুতের সাহায্যেই কাজ করতে পছন্দ করেন।"
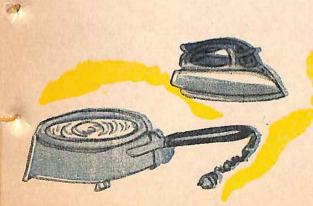
"বিদ্যুতের সাহায্যে যেসব যন্ত্র চালানো হয় সেগুলো খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। সেগুলো খুব কম যায়গা জুড়ে থাকে, আর সে-গুলোতে একটুও ধোঁয়া হয় না।"

"হ্যাঁ," যতীন বলে। "এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে কতগুলো কাজের জন্য বিদ্যুৎই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু কোন কোন কাজের জন্য তাপ সবচেয়ে ভালো। তেমনি আবার অন্য কোন কোন কাজের জন্য স্রোত জলের আর হাওয়াই বেশী উপযুক্ত।"

তুমি কি জান?

নীচে যে সাত রকমের যন্ত্র দেখানো হয়েছে সেগুলোর কোনটা কী?
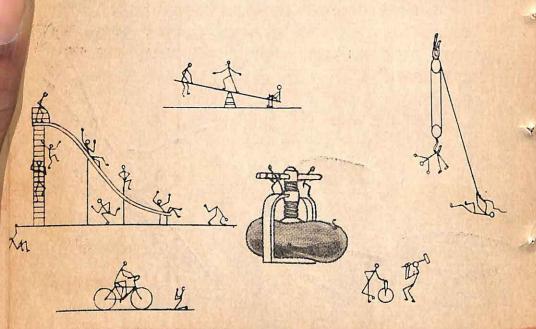
আরও যা করতে হবে

(১) সবরকম সহজ যন্ত্র দেখিয়ে একটা ছোট প্রদর্শনী সাজাও

(২) আঙুলের ওপর একটা মাপকাঠি ঠিক ভাবে রাখ। প্রতি দিকে কত ইঞ্চি ক'রে আছে?

(৩) একটা পেন্সিলের চারধারে পেঁচালভাবে কিছুটা সুতো জড়াও যাতে করে সূতোটা 'স্ক্রু'র প্যাঁচের মতো দেখায়।

(৪) একটা খালি কাটিম আর একটুকরো তার দিয়ে একটা কপিকল তৈরী করো। কপিকলটাকে কিছুর সঙ্গে বেঁধে সেটার সাহায্যে কোন ভারী জিনিষ তুলতে চেষ্টা করো।

(৫) ছুরীর ফলাটাও একরকম গোঁজ। আরও গোটাকয়েক যন্ত্রপাতির নাম করো যেগুলো আসলে গোঁজ।

(৬) খালি কাটিম চাকা হিসেবে ব্যবহার করে' একটা খেলনার গাড়ী তৈরী করো।

(৭) একখানা বড়ো বইয়ের উপর একটা মার্বেল রাখো। মার্বেল-টাকে সামনে পেছনে গড়াতে থাকো, কিন্তু দেখো সেটা যেন বইয়ের উপর থেকে পড়ে না যায়।

প্রশ্ন

(১) স্কুলবাড়ীর ভেতরে বা কাছাকাছি এমন কোন যায়গার নাম করতে পারো যেখানে বিভিন্ন রকমের সহজ যন্ত্রপাতির প্রত্যেক-টিই তুমি দেখেছো ?

(২) বাড়ীতে কোন্ কোন্ রকমের সহজ যন্ত্রপাতি তুমি ব্যবহার করো ?

(৩) একখানা বাইসাইকেলে তুমি কতো রকমের সহজ যন্ত্র খুঁজে বের করতে পারো ?

(৪) বিদ্যুৎ কী করে' তৈরী করা যায় ? আমাদের বাড়ীতে বাড়ীতে বিদ্যুৎ আনা হয় কী করে ?

(৫) বিদ্যুতের সাহায্যে কী কী রকমের কাজ করা যায় ?

(৬) বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে শেখবার আগে লোকে এসব কাজ কী করে করতো ?

(৭) তাপ দিয়ে কী করে' কাজ করা যায় ?

(৮) জলের স্রোত দিয়ে কী করে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজ করা যায় ?

(৯) হাওয়া দিয়ে কী করে কাজ করা যায় ?

(১০) কাজকর্মের জন্য কী কী জীবজন্তু ব্যবহার করা হয় ?

পৃথিবীর গতি

বনবাসী বৃদ্ধ
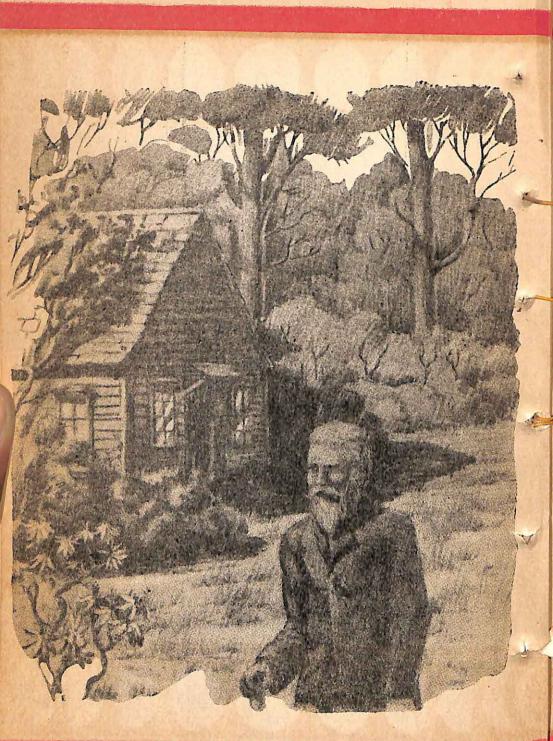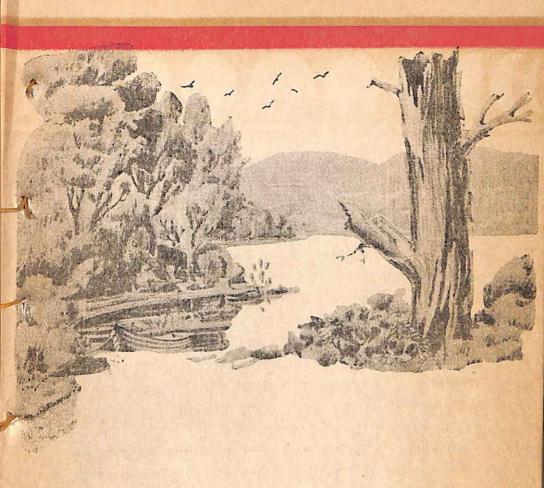
এক বৃদ্ধ থাকতো এক গভীর, অন্ধকার বনের ঠিক মাঝখানে। সে বাস করতো একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে, আর সে জীবনে কোনদিন সেই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোয়নি। একদিন সে মনে মনে ভাবলো, "এই গভীর, অন্ধকার বনের বাইরের জগৎটা না জানি কেমন। একবার গিয়ে দেখে এলে মন্দ হয় না।"

এই ভেবে সেই বৃদ্ধলোকটি তার লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। সে হাঁটছে তো হাঁটছেই। অবশেষে বনের গাছগুলো ছোট আর পাতলা হ'য়ে এলো, আর সে সূর্য্যের আলো দেখতে পেলো। অ-নে-ক ক্ষণ পরে সে বনের কিনারায় এসে উপস্থিত হ'লো। তার চোখে পড়লো নীচের প্রসারিত সবুজ উপত্যকা।

বৃদ্ধলোকটি খাঁড়া পাহাড়ের গা' বেয়ে নামতে লাগলো। সবে যখন তার পৃথিবী দেখা শুরু হয়েছে এমন সময় তো আর সে ফিরে যেতে পারেনা। নিজের বাড়ী ছাড়া সে জন্মে কখনো অন্য বাড়ী দেখেনি। উপত্যকার মধ্যে সে দেখতে পেলো শতশত বাড়ী। "একটা বাড়ীতে ঢুকে' দেখলে মন্দ হয়না," সে মনে মনে ভাবলো। "এবাড়ীগুলোর ভেতরটা কেমনতরো তা আমি জানতে চাই।"

একযায়গায় লম্বা একসার বাড়ী দেখে বৃদ্ধলোকটির খুব কৌতূহল হ'লো! প্রত্যেক বাড়ীতে আবার কেমন সার সার জানালা। এতো জানালা সে কোনদিন দেখেনি।

সে দেখলো অনেক লোক সেই বাড়ীগুলোর মধ্যে ঢুকেছে, আবার লোক বেরিয়ে আসছে। "এই তো মহা সুযোগ," বৃদ্ধলোকটি মনে ভাবে। "আমিও ভেতরে ঢুকে পড়ি। এতো লোক আসা-যাওয়া করছে যে আমাকে কেউ লক্ষ্যও করবেনা।" এই ভেবে সে সিড়ী বেয়ে উঠে ভেতরে ঢুকে গেলো।

সে ভেতরে ঢুকতেই বাড়ীটা 'হুস্' করে চলতে শুরু করলো। মেঝেটা নড়ে উঠতেই বৃদ্ধলোকটি একটা আসনে বসে' পড়ে। বাড়ীটার দু'ধারে আসনগুলো পরপর সাজানো, আর ঠিক মাঝখানে চলাফেরার রাস্তা। "এমন বাড়ীতো আর কখনো দেখিনি," মনে মনে এই কথা বলে' বৃদ্ধলোকটি জানালার বাইরে তাকায়।

অমনি "আমি কোথায়? আমি কোথায়?" বলে' সে চেঁচিয়ে উঠে; কারণ, এতোক্ষণে সে বেশ ঘাবড়ে গেছে। "এরকম জানালার পাশ দিয়ে ঘরবাড়ী গাছপালা ছুটে যেতে তো আমি কোনদিন দেখিনি। নাঃ, আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে পৃথিবীটা অনেক বেশী আশ্চর্য যায়গা।"

তার ঠিক পরের আসনটিতে যে লোকটি বসেছিলো সে বৃদ্ধলোক যে কথাগুলি বলছিলো তা শুনতে পেলো। "বাড়ীঘর আর গাছপালা তো নড়ছেনা," সে বললো। "আমরাই নড়ছি। কী আজগবী কথা বলছেন! এর আগে কোনদিন রেলগাড়ীতে চড়েন নি?"

"না, বাপু, আমার তো বিশ্বাস হয়না," বৃদ্ধলোকটি বলে। "আমিতো আর চোখের মাথা খাইনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে বাড়ীঘর গাছপালাগুলো জানালার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।" এভাবে অনেকক্ষণ ওদের তর্ক চলে, কিন্তু বৃদ্ধলোকটি শেষ অবধি নাছোড়বান্দা হয়ে বলতে থাকে যে বাড়ীঘর আর গাছপালাগুলোই ছুটে যাচ্ছে।
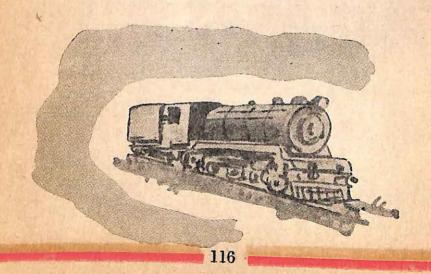
রেলগাড়ীটা যখন অন্য এক সহরে এসে থামলো তখন বৃদ্ধলোকটি নেমে তার বাড়ীর পথ ধরলো। "যথেষ্ট পৃথিবী দেখা হয়েছে," সে নিজের মনে বলতে লাগলো। আজও সেই বৃদ্ধলোকটি বনের মাঝ-খানে তার সেই ছোট কাঠের ঘরটায় বসে' বসে' সেই আশ্চর্য বাড়ী আর তার জানালার পাশ দিয়ে গাছপালাগুলো ছুটে যাবার দৃশ্য মনে মনে ভাবে।

পৃথিবী যে ঘুরছে তা আমরা জানি কী করে'

গল্পের এই বৃদ্ধটির মতো লোক অনেক-আছে। তারা দেখে সূর্য আর চাঁদ পুবদিকে উঠে। তারা লক্ষ্য করে যে সূর্য আর চাঁদ আকাশের এপার থেকে ওপারে যায়। তারা ভাবে যে পথিবী এক যায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, আর সূর্য ও চন্দ্র তার চারপাশে ঘুরছে।

কিন্তু সূর্য আর চাঁদ দুই-ই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। সেগুলো এতো দূরে যে তাদের পক্ষে একদিন পৃথিবী সম্পূর্ণ ঘুরে' আসা সম্ভব নয়।
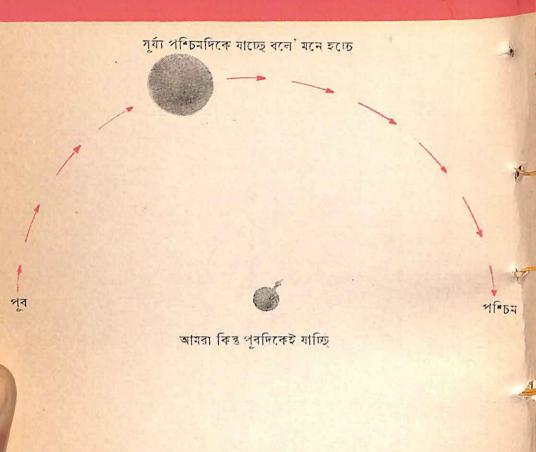
আমরা যখন হাঁটি তখন আমরা জানি যে আমরা চলছি। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমরা দু'পাশের ঘড়বাড়ীগুলোকে পেরিয়ে যাই। বাড়ীঘর বা গাছপালা আমাদেরকে পেরিয়ে যায় না।

কিন্তু সূর্য বা চাঁদ দেখার সময় আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে পৃথিবীটা চলছে। গল্পের সেই বৃদ্ধলোকটির মতো আমাদেরও কেমনতরো ভুল হয়ে যায়। আমরা ভুলে যাই যে পৃথিবীটাই ঘুরছে, সূর্য ও চাঁদ নয়।

দিন রাত্রি হয় কেন

কল্পনা করা যাক যে পৃথিবীটা যেন মস্তোবড়ো একটা 'বল', আর আমরা তার উপর দাঁড়িয়ে আছি। এর সঙ্গে একথা কিন্তু ভুললে চলবে-না যে আর একটা প্রকাণ্ড 'বলের মতো সূর্যটা অনেক দূরে আছে।

নীচের ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে এই পরীক্ষাটা করতে চেষ্টা করো। সূর্যের জন্য একটা খুব জোরালো আলো ব্যবহার করো। পৃথিবীর জন্য একটা 'গ্লোব' ব্যবহার করো। ঘরটাকে যদি অন্ধকার করে' নিতে পারো তবে পরীক্ষাটা বেশ জমবে।
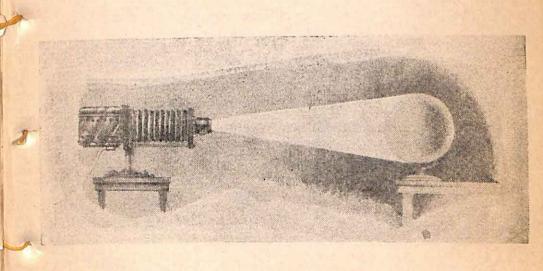
এই পরীক্ষা করবার ও জানবার গোটাকয়েক জিনিষ

(১) সূর্যের আলো কি একই সময়ে পৃথিবীতে সব যায়গায় সমান ভাবে পড়তে পারে? পৃথিবীর কতোখানি যায়গায় সূর্যের আলো একবারে পড়তে পারে?

(২) পৃথিবীর কোন অংশে দিন তা বের করো। কোন অংশে রাত তা বের করো। তুমি যেখানে বাস করো সে যায়গাটা বের করো। সেযায়গাটায় 'X' চিহ্ন দিয়ে দাও। যেখানে 'X' চিহ্ন দিয়েছো সেখানে দিন না রাত?

(৩) এখন আস্তে আস্তে 'গ্লোব'টাকে ঘোরাও। যে যায়গাটাতে 'X' চিহ্ন দিয়েছো সেখানে কি রাত থেকে দিন হয়ে যাচ্ছে?

(৪) 'X' চিহ্ন দেওয়া যায়গাটা যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকবে তখন সেখানে দুপুরবেলা হবে। আচ্ছা, এবারে বলতে পারো গ্লোব'টার উপর কোথায় সকাল, কোথায় বিকেল, আর কোথায় মাঝরাত?

(৫) কোন একদিনের দুপুরবেলা থেকে শুরু করে' তার পরের দিনের দুপুরবেলা পর্যন্ত ক'ঘণ্টা হয়?

দুপুর

বেলা ১১টা

বেলা ১০টা

বেলা ৯টা

বেলা ৮টা

বেলা ৭টা

ছায়া

ছায়াগুলো যে অনবরত সরে' সরে' যায় তা থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবীটা অনবরত ঘুরছে। ঘরের মেঝেয় কোন ছায়ার কিনারার উপর নজর রাখলেই দেখা যায় যে ছায়াটা ক্রমেই সরে' যাচ্ছে। রোদ আর ছায়ার মাঝখানে একটা দাগ দিয়ে রাখো। ঠিক দশ মিনিট পরে সেই দাগটার পানে চেয়ে দেখো।

অ-নে-ক দিন আগেকার মানুষদের ঘড়ি ছিলো না। তারা রোদ দেখে সময় বলতে শিখেছিলো।
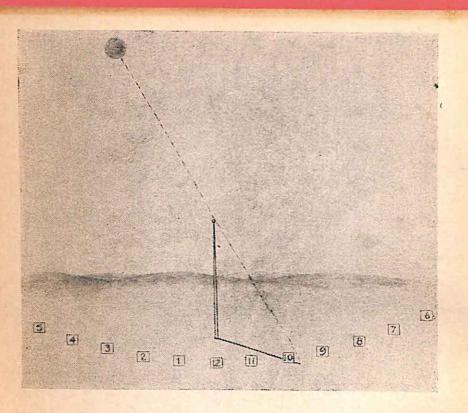
প্রথমে তারা সূর্য আকাশের কোন যায়গায় আছে তা দেখে বেলা আন্দাজ করতো। পরে তারা ছায়াদণ্ড তৈরী করতে শিখেছিলো। ছায়াদণ্ড কী করে কাজ করে তা জানো?

তুমি খুব সহজেই একটা ছায়াদণ্ড তৈরী করে নিতে পারো। একটা লম্বা লাঠির একধার মাটির মধ্যে পুঁতে দাও। সূর্য উঠলেই লাঠিটার ছায়া পড়বে।

খুব সকালবেলা ছায়াটা পশ্চিম মুখো হয়ে পড়বে। দুপুরবেলা সেটা হবে উত্তরমুখো। আর বিকেল বেলা সেটা পূর্বমুখো হবে। সকাল বেলা আটটার সময় ছায়ার ঠিক ডগায় একটুকরো পিজবোর্ড মাটিতে এঁটে দাও। পিজবোর্ডের টুকরোটার উপরে '৮' সংখ্যা লিখে রাখো। সকালবেলা ঠিক ন'টার সময় ছায়ার ডগায় ঠিক এমনি করে আর একটুকরো পিজবোর্ড এঁটে তাতে '৯' সংখ্যা লিখে রাখো। এভাবে যতক্ষণ না সূর্য অস্ত যায় ততোক্ষণ প্রতি ঘন্টায় এরকম করতে থাকো। এরপর রোদ উঠলে তুমি ছায়াদণ্ডের দিকে তাকিয়েই বলতে পারবে ক'টা বেজেছে।

পতাকাদণ্ড বেশ ভালো ছায়াদণ্ডের কাজ করে। এর ছায়ার ডগাটার দিকে নজর রেখে দেখো কত তাড়াতাড়ি সেটা সরে সরে যাচ্ছে।

ছায়া কি পশ্চিম থেকে পূবে যায়, না পূব থেকে পশ্চিমে যায়? পৃথিবী কি পশ্চিম থেকে পবে ঘোরে না পূব থেকে পশ্চিমে ঘোরে?

প্রথম লুব্ধক

রোহিণী

লুব্ধক

তারা

তারাগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেও আমরা বুঝতে পারি যে পৃথিবী ঘুরছে। শীতকালের আকাশের দক্ষিণ দিকে অনেকগুলো উজ্জ্বল তারা দেখা যায়। এই পৃষ্ঠায় যে আকাশের মানচিত্র দেওয়া হলো তাতে কতগুলো তারার নাম দেওয়া হলো। প্রথমে মানচিত্রটা দেখো, তারপর আকাশের দক্ষিণ দিকে তাকাও। কতগুলো তারার নাম জেনে নাও, আকাশের বুকে সেগুলোকে খুঁজে বের করো।

যদি তারাগুলোর দিকে নজর রাখো তবে দেখতে পাবে যে সেগুলো যেন পূব থেকে পশ্চিমে সরে সরে যাচ্ছে। প্রতি রাত্রেই তারাগুলো পূব দিকে উঠে। দেখে মনে হয় সেগুলো যেন আকাশের উপর দিয়ে পূব থেকে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে। তারপর সেগুলো পশ্চিমে অস্ত যায়। পৃথিবী যদি না ঘুরতো তবে তারাগুলোকে সবসময় আকাশের একযায়গায়ই দেখা যেতো।

পৃথিবী যদি না ঘুরতো তবে সূর্য উঠতোনা, অস্তও যেতোনা। সেটাও সব সময় আকাশের একই যায়গায় থাকতো। তা হলে পৃথিবীর এক অর্ধেকে সবসময়ই রোদ থাকতো। দিন-রাত্রির পরিবর্তন হ'তো না।

পৃথিবী অনবরত ঘোরে কেন

ভেবে দেখো তো পৃথিবী কতো ভারী! পৃথিবীর পাহাড় পর্বত আর বিশাল সাগরগুলোর জলের কথাও ভেবে দেখো। আরও ভেবে দেখো যে পাহাড়-পর্বতগুলোর তলায় পরতে পরতে আছে বিরাট বিরাট পাথর। সাগরগুলোর তলায়ও মাইলের মাইল পর গভীর পাথরের পর্বত আছে।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে পৃথিবীর মাঝখানটা লোহার তৈরী। লোহা পাথরের চেয়ে ভারী।

পৃথিবী এতো বিশাল আর এতো ভারী যে কিছুই এটাকে থামাতে পারে না। তাই এটা খালি ঘুরছে তো ঘুরছেই।
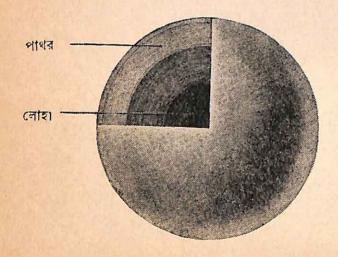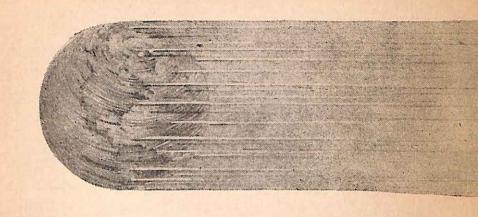
পৃথিবীর অন্য গতি

তুমি কি জানো যে পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে কখনো এক জায়গায় দাঁড়ায় না ? পৃথিবী মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায়। বন্দুকের গুলি যে বেগে ছুটে যায় তার চেয়েও বেশী বেগে পৃথিবী দিন রাত ছুটছে। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটছে।

তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারো : এতো বেগে ছুটতে ছুটতে পৃথিবী যাচ্ছে কোথায় ? পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। সূর্য এতো দূরে যে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর পুরো একবছর লাগে।

পৃথিবী যে পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরে সে পথটা প্রায় গোল। প্রতি বছর একই পথে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

সূর্যের চারদিকে ঘুরবার সময় পৃথিবী কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খায় না, কোন কিছুর সঙ্গে ঘষাও লাগে না পৃথিবীর। পৃথিবী অমনি বছরের পর বছর সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

প্রশ্ন
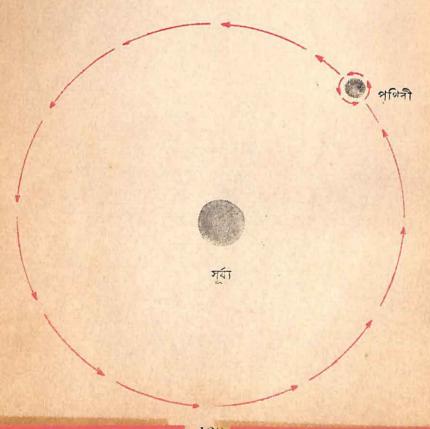
(১) পৃথিবীর দু'টো গতি কী কী?

(২) সূর্য ও তারাগুলো নড়ছে বলে' মনে হয় কেন?

(৩) পৃথিবীর ঘোরা কখনো থামে না কেন?

(৪) দিন রাত্রি হবার কারন কি?

(৫) দূরবীন কী কাজে লাগে?

(৬) গল্পের বৃদ্ধলোকটি কেন ভেবেছিলো সে বাড়ীঘর আর গাছপালা গুলো ছুটছে?

(৭) অন্য কারো কাছে তুমি কি করে' প্রমাণ করবে যে পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই?

(৮) আমরা কী করে জানি যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরেনা?

কী কী করতে হবে ও ভাবতে হবে

(১) খানিকটা সতোর একদিকে একটুকরো চা-খড়ি বেঁধে নাও। সুতোর অন্য দিকটা পেরেক দিয়ে মেঝেয় আটকে দাও। এখন সুতোটাকে টান টান করে' মেঝেয় একটা বড়ো বৃত্ত আঁকো। কাউকে সুর্য হয়ে বৃত্তটার কেন্দ্রে দাঁড়াতে বলো। অন্য কাউকে পৃথিবী হয়ে বৃত্তের রেখা ধরে সুর্যের চারদিকে চলতে বলো। মনে রেখো পৃথিবী কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে সুর্যের চারপাশে চলে।
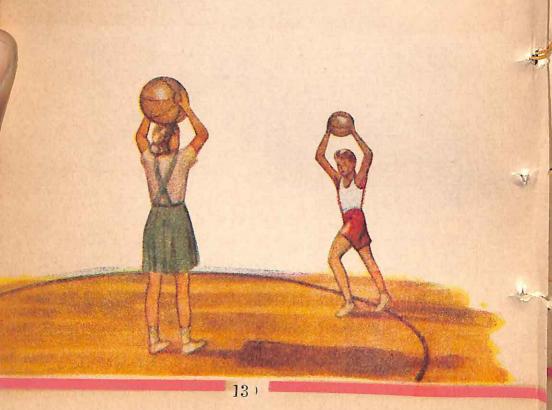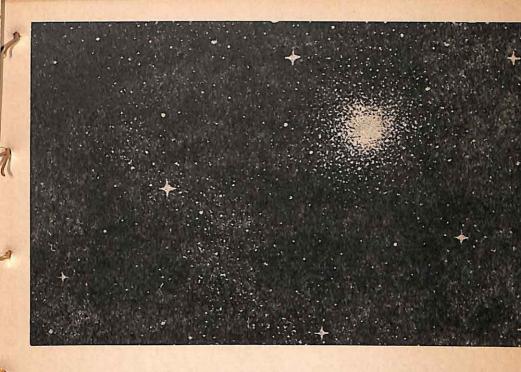
(২) একটা 'গেলাব' হাতে নিয়ে বৃত্তটা ঘুরে এসো। 'গেলাব'টাকে সেসময় ঘোরাতে থাকো।

(৩) দেখো তো সপ্তাহে, মাসে ও বছরে— কিসে কতবার করে' পৃথিবীটা ঘোরে।

(৪) পৃথিবীর দুরকম গতি দেখিয়ে ছবি আঁকো।

(৫) দূরবীনের ছবি এবং দূরবীনের ভেতর দিয়ে তোলা ছবি যোগাড় করো।

সঠিক উত্তর বলো

(উত্তরগুলো বইয়ে লিখো না। সেজন্য অন্য কাগজ ব্যবহার করো)

(১) ছায়া সবসময় সরে (ক) পুব থেকে পশ্চিমে (খ) পশ্চিম থেকে পুবে (গ) উত্তর থেকে দক্ষিণে।
(২) পৃথিবী চারদিকে ঘোরে (ক) তারাগুলির (খ) চাঁদের (গ) সূর্যের।
(৩) এক সপ্তাহে পৃথিবী ঘোরে (ক) তিনবার (খ)সাতবার (গ)চব্বিশবার।
(৪) পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে এক (ক) দিনে (খ) সপ্তাহে (গ) বছরে।
(৫) পৃথিবীর এক এক বার ঘোরার জন্য লাগে (ক) এক ঘণ্টা (খ) বারো ঘণ্টা (গ) চব্বিশ ঘণ্টা।

বলো কোনটা ঠিক

(১) সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।
(২) তারাগুলো পুবদিকে উঠে।
(৩) পৃথিবী সবসময়ই চলছে।
(৪) ছায়াগুলো পূবদিকে যায়।

উদ্ভিদ কী করে' জন্মায়
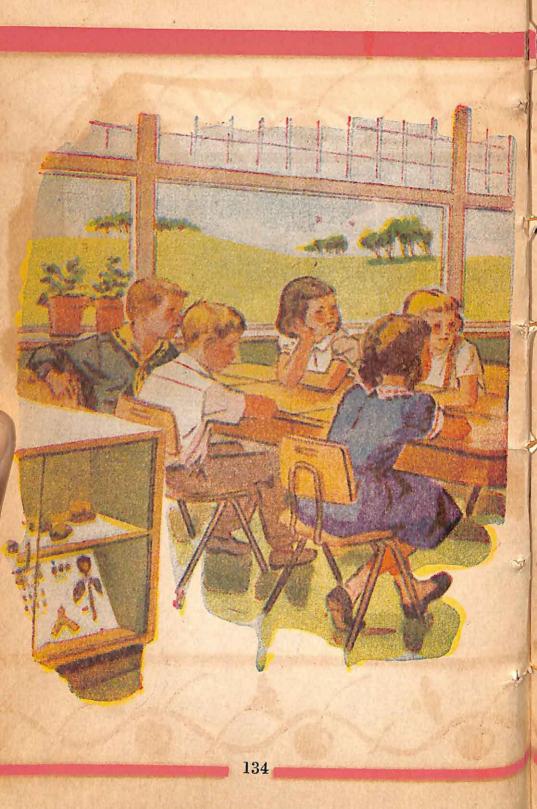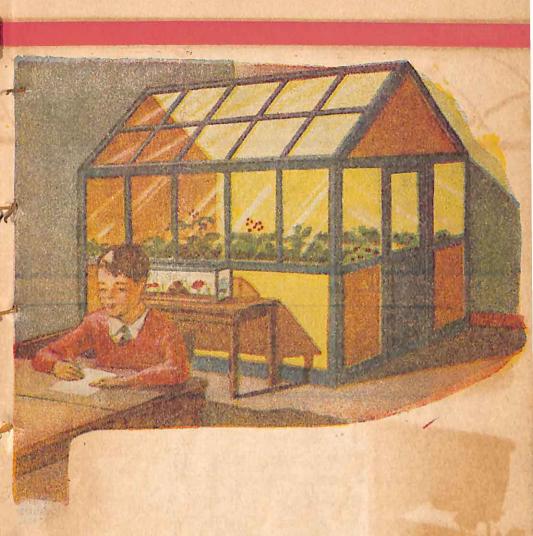
যতীনের ধাঁধা

যতীনের ক্লাশের ছেলেমেয়েরা ধাঁধা বলছিলো। প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ে একটা করে' ধাঁধা বানিয়ে নিয়ে এসেছিলো, আর ক্লাশের অন্য সবাই সেটার উত্তর দেবার চেষ্টা করছিলো। আজ ধাঁধা বলবার পালা ছিলো যতীনের।

যতীনের ধাঁধাটা ছিলো এইঃ

আমার তো চোখ নেই, ছিলোও না কখনো ;
আমার তো পা' নেই, ছিলোও না কখনো ;
আমার তো মুখ নেই, ছিলোও না কখনো ;

তবুও একসময় আমাকে জ্যান্ত গোর দেওয়া হ'য়েছিলো। যেহেতু চোখ ছিলো না, সেজন্য আমি কিছুই দেখতে পাইনি ; যেহেতু পা' ছিলো না সেজন্য আমি হামাগুড়ি দিতে পারিনি ; যেহেতু মুখ ছিলো না সেজন্য আমি হাঁক দিতেও পারিনি ;

তবুও কিন্তু আমি একাই বেরিয়ে এসেছিলাম। বলতো আমি কী ?

"তুমি কি জ্যান্ত ?" পরেশ জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ, আমি জ্যান্ত," যতীন বলে।

"তুমি কি মস্তোবড়ো ?" প্রদীপ জিজ্ঞাসা করে।

"এখন আমি মস্তোবড়ো" যতীন বলে।

ওরা সবাই যতীনের ধাঁধাটার উত্তর ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। অবশেষে মণিকা কথা বলে।

"আমি জানি তুমি কী," মণিকা বলে। "তুমি গাছ। কিন্তু এক-সময় তুমি বীজ ছিলে। বীজ তো আসলে শিশুচারা।"

"ধাঁধাটা কিন্তু বেশ ছিলো," সুষমা বলে, "কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছা করে শিশুচারা কী করে মাটি থেকে বেরোয়।"

"আমারও জানতে ইচ্ছা করে," ওরা সবাই একসঙ্গে বলে' উঠে। তখন ওরা স্থির করে যে বিষয়টা ওরা নিজেরাই জানতে চেষ্টা করবে।
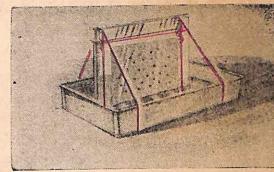
বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম লক্ষ্য করা

ছেলেমেয়েরা প্রথমেই দুখানা চোকা কাচের টুকরা আর এক টুকরা ব্লটিং কাগজ যোগাড় করলো। ব্লটিং কাগজের টুকরাটা ওরা চোকা কাচ দুটোর একটার উপর রাখলো। ব্লটিং কাগজের উপর ওরা কয়েক রকমের বীজ রাখলো। তারপর চোকা কাচের অন্য টুকরা ওরা উপরে বসিয়ে কাচের টুকরা দুটো, ব্লটিং কাগজ আর বীজ খানিকটা সূতো দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে দিলো। কাচের টুকরার ধারগুলো যাতে অগভীর জলে থাকে এমনভাবে রেখে ওরা বীজগুলো ভিজে থাকার ব্যবস্থা করলো।

বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম

ওরা প্রতিদিনই বীজগুলোকে ভালো করে লক্ষ্য করে' দেখতো। বীজগুলোর কী হচ্চিলো তা দেখতে ওদের বেশ মজা লাগছিলো। মাটিতে পুঁতলে বীজগুলো যেমন করে' বাড়তো বীজগুলো ঠিক তেমনি করেই বাড়ছিলো।

প্রথমে বীজগুলো বড়ো হ'তে লাগলো। সেগুলো কিছু কিছু জল নিচ্ছিলো বলেই ওরকম হচ্ছিলো। শীগ্গিরই বীজগুলোর খোঁসা ফেটে গেলো।

পরের দিন প্রায় সবগুলো বীজেই ছোট ছোট অঙ্কুর দেখা গেলো। অঙ্কুরগুলো সবই নীচের দিকে বাড়তে লাগলো, মাটিতে পুঁতলে যেমন হ'তো ঠিক তেমনিভাবে। অঙ্কুরগুলোর ডগায় ছোট ছোট চুল গজালো। উদ্ভিদ-শিশুদেরকে জল নিতে সাহায্য করলো।

আরও কয়েক দিনের মধ্যে বীজগুলো থেকে ছোট্ট ছোট্ট ডাঁটা বেরুলো। ডাঁটাগুলোর ডগায় পাতা ছিলো।

উদ্ভিদ-শিশুরা কোথায় তাদের খাবার পায়

উদ্ভিদ-শিশুরা যখন চৌকা কাচের টুকরা দু'টোর মধ্যে বড়ো হ'য়ে উঠছিলো তখন ছেলেমেয়েরা অনেক রকম প্রশ্ন করছিলো। উদ্ভিদ শিশুগুলোকে ভালো করে' নজর করে দেখে ওরা প্রায় সব প্রশ্নেরই জবাব খুঁজে পেয়েছিলো। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর ওরা কেউ খুঁজে পায়নি।

"উদ্ভিদ-শিশুরা কী খায়?" প্রশ্নটা ছিলো এই। ওরা দেখেছিলো যে উদ্ভিদ শিশুরা শুধু জলই পাচ্ছে। কিন্তু ওরা বুঝতে পারছিলো না শুধু জল খেয়ে উদ্ভিদ-শিশুগুলি বাঁচবে-ই-বা কেমন করে আর বাড়বে-ই-বা কেমন করে।

"বিবর্ধন কাচ দিয়ে উদ্ভিদ-শিশুগুলিকে দেখা যাক," তনুকা বলে। "তা হ'লে হয়তো বেশ বোঝা যাবে।

বিবর্ধন কাচের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ শিশুগুলিকে এই বড়ো বড়ো দেখাচ্ছিলো। বীজগুলো তখনও সেগুলিতে লেগেছিলো।

"দ্যাখো, দ্যাখো!" পরেশ চেঁচিয়ে উঠে। "বীজগুলো কুঁচকে গেছে। সেগুলো আগে যতো বড়ো ছিলো এখন আর ততো বড়ো নেই।"

"কেন এরকম হয়েছে তা আমি জানি," মণিকা বলে। "বীজের মধ্যে জমানো খাবার সম্বন্ধে আমরা আগে যা জেনেছিলাম তা মনে নেই?"

"হ্যাঁ, তাইতো," তনুকা বলে, "এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে খুব ছোট থাকার সময় শিশু-উদ্ভিদ কী খেয়ে বাঁচে। ওরা জমানো খাবার খায়।"

যা করতে হবে
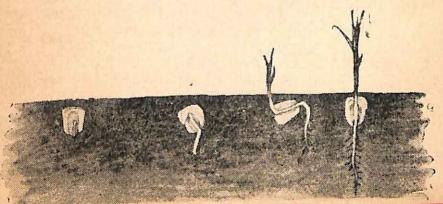
(১) ভিজে কাঠের গুড়ো, বালি, তুলা, মাটি ও অন্যান্য জিনিষে বীজ বপন করো।

(২) পরীক্ষা করে দেখো শুকনো মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় কি না।

(৩) যতো রকমের পারো বীজ সংগ্রহ করো।

(৪) বাক্সের মধ্যে বিলাতী বেগুন অথবা বাঁধাকপির চারা করতে চেষ্টা করো

(৫) বীজ থেকে আসে এমন যতোরকমের খাবার তুমি খাও সে গুলোর একটা তালিকা তৈরী করো।

(৬) একটা খালি যায়গা থেকে খানিকটা মাটি খুড়ে নাও। সেই মাটিটুকুন একটা ফুলের টবে রেখে দেখো মাটির মধ্যে লুকিয়ে থাকা বীজ থেকে কতোরকমের উদ্ভিদ গজাবে।

(৭) বাড়ীতে যেসব উদ্ভিদ আছে সেগুলোর অংশ ভেঙে নিয়ে জলের মধ্যে সেগুলোকে গজাতে চেষ্টা করো।

(৮) জলের গ্লাসের তলায় একটু জল রেখে সেখানে একটা আলু রেখে দাও। নজর রেখো কখন আলুর চোখগুলো থেকে কুঁড়ি বেরোয়।
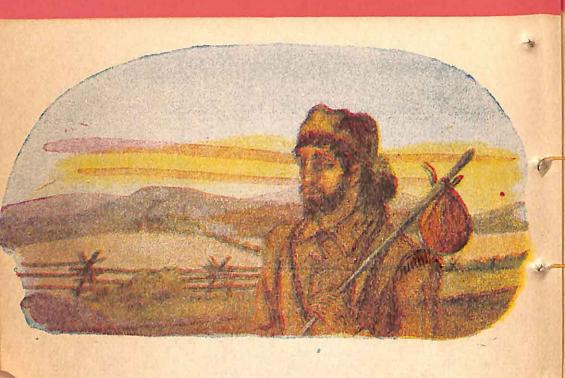
জনী অ্যাপ্‌লসীড

অ-নে-ক বছর আগে আমেরিকায় একজন খুব গরীব লোক বাস করতো, সে তার দেশের নানান যায়গায় ঘুরে' বেড়াতো। সে সব সময় তার পিঠে এক থলে আপেলের বীজ নিয়ে বেড়াতো বলে' লোকে তাকে "জনী অ্যাপ্‌লসীড" বলে' ডাকতো।

সে সময় আমেরিকার পশ্চিম দিকে লোকের বসতি ছিলো না। প্রতি বসন্তকালে জনী অ্যাপ্‌লসীড তার আপেল বীজের থলে ঘাড়ে করে সেখানে যেতো, আর যেতে যেতে আপেলের বীজ বুনে' যেতো।

প্রতি শরৎকালে সে আরও আপেলের বীজ সংগ্রহ করতো।

লোকে জনী অ্যাপ্‌লসীডের কাণ্ড দেখে হাসতো, কিন্তু যেসব বীজ সে বুনেছিলো সেগুলো বেড়ে আপেলের গাছ হ'য়ে উঠেছিলো। অনেক বছর পরে বাস করার যায়গা খুঁজতে লোকজন পশ্চিমদিকে আসতে শুরু করলো। তারা আপেল গাছগুলোর ধারে ধারে তাদের বাড়ীঘর তৈরী করতে লাগলো।

বসন্তকালের ফুল

আমাদের দেশে যেসব যায়গায় শীতকালে বরফ পড়ে সেসব যায়গায় যখন বসন্তকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফুটতে সুরু করে তখন লোকেরা খুব খুসী হয়। কোন কোন যায়গায় বরফ ফুঁড়েও ফুল বেরোয়। বসন্ত-কালের কতরকম ফুলের নাম তুমি জানো? তুমি যেখানে বাস করো সেখানে বসন্তকালের কোন্‌ ফুল সকলের আগে ফোঁটে?
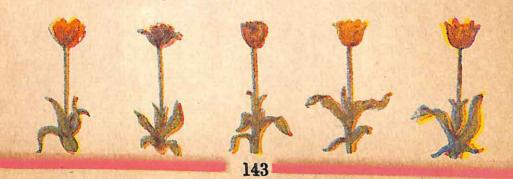
যে ফুলগুলো সকলের আগে ফোঁটে সেগুলো কিন্তু বীজ থেকে আসে না। কারণ বসন্তকালের অতো গোড়ার দিকে বীজ অঙ্কুরিত হ'বার পক্ষে তখনো খুব ঠাণ্ডা থাকে।

ফুলগাছের শিকড় ও কন্দ থেকে শীগ্গির শীগ্গির ফুল ফোঁটে। কখনো কখনো আমরা বাড়ীর উঠানে শিকড় অথবা কন্দ লাগিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফুল ফোঁটাবার ব্যবস্থা করি—এমন কি গাছে গাছে পাতা ধরবার আগেই। ছোট ছোট টবে কন্দ লাগিয়ে সেগুলো যদি একটু গরম যায়গায় রেখে দেওয়া যায় তবে বছরের যে কোন সময়েই সেগুলো বাড়তে পারে।

আগে এই বইয়ের এক যায়গায় তোমরা পড়েছো যে উদ্ভিদ তার নানা অংশে খাবার জমিয়ে রাখে। অনেক উদ্ভিত শিকড়, কন্দ প্রভৃতি মাটির নীচেকার অংশগুলিতে খাবার জমিয়ে রাখে। বসন্তকালের প্রথম উষ্ণ দিনগুলিতে তারা বেড়ে উঠবার জন্য এই খাবার ব্যবহার করে। এই জন্যই কোন কোন ফুল এতো সকালে ফুট্তে পারে।

কন্দ থেকে উদ্ভিদ জন্মানো

স্কুলঘরে কয়েকটা কন্দ ফুল জন্মাতে চাও? কয়েক রকম কন্দ ফুল আছে, যেগুলো বেশ ভালোভাবে বাড়ে আর যেগুলো খুব চমৎকার ফুল হয়। কন্দগুলোর বেড়ে উঠার জন্য মাটির দরকার হয়না, কেননা সেগুলোর মধ্যেই তো প্রচুর খাবার জমানো আছে।

কন্দগুলো লাগাতে হয় টবের মধ্যে পাথর আর জল ভরে' তাতে। পাতা গজাতে শুরু করার আগে অবধি সেগুলোকে অন্ধকারে রাখতে হয়। আলোতে আনবার কয়েকদিন পরেই সেগুলোতে ফুল ধরে।

একটা কন্দ চিরলেই চারাগাছটা যে জমানো খাবার খেয়ে বাড়ে তা তুমি দেখতে পাবে। একটা পিঁয়াজের কন্দ চিরতে দেখবে বেশ মজা লাগবে। যে খোসাগুলো খসে আসবে সেগুলো কিন্তু আসলে পাতা। সেগুলোর ভেতরে খাবার জমানো থাকায় ওরকম মোটা দেখায়। পিঁয়াজের কন্দও ঠিক ফুলের কন্দের মতোই জলে বাড়তে পারে।
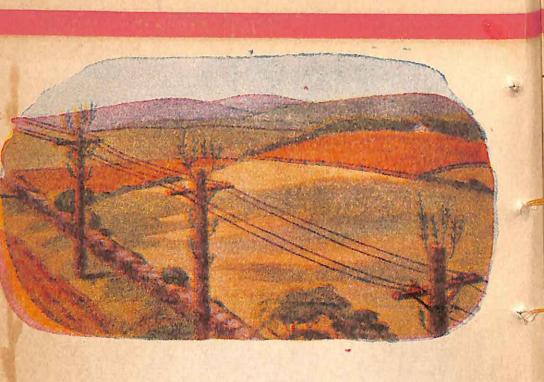
যে সমস্ত ডাঁটা থেকে নতুন চারা জন্মায়

অনেক দিন আগে জনকয়েক লোক একজায়গায় টেলিফোনের তার বসাচ্ছিলো। তারা টেলিফোনের থামের জন্য কতগুলো গাছ কেটে নিয়েছিলো। আর মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেগুলিকে পুঁতে দিয়েছিলো। তারপর তারা সেই থামগুলোতে তার লাগিয়ে দিয়েছিলো।

আবহাওয়াটা এতো সেঁতসেঁত ছিলো যে একাজ করতে ওদেরকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো, কারণ প্রায় সারাক্ষণই বৃষ্টি হচ্ছিলো।

টেলিফোন লাগাবার কাজ শেষ হবার কয়েক সপ্তাহ পরে এক গণ্ডগোল দেখা দিলো। কারণ ওখানকার মাটি এতো ভিজে ছিলো যে খামগুলোর ভেতরে জল উঠতে লাগলো। টেলিফোনের থামগুলো থেকে ডালপালা গজাতে লাগলো, আর সে সমস্ত ডালপালার পাতা ধরতে শুরু করলো। তুমি যদি গোলাপ গাছের ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে রাখো তবে দেখবে সেটা বাড়তে থাকবে, তার গোড়ায় শিকড় গজাবে আর উপরে পাতা ধরবে। কিছুদিন পরেই সেটা একটা পুরোপূরি গোলাপ গাছ হয়ে উঠবে।
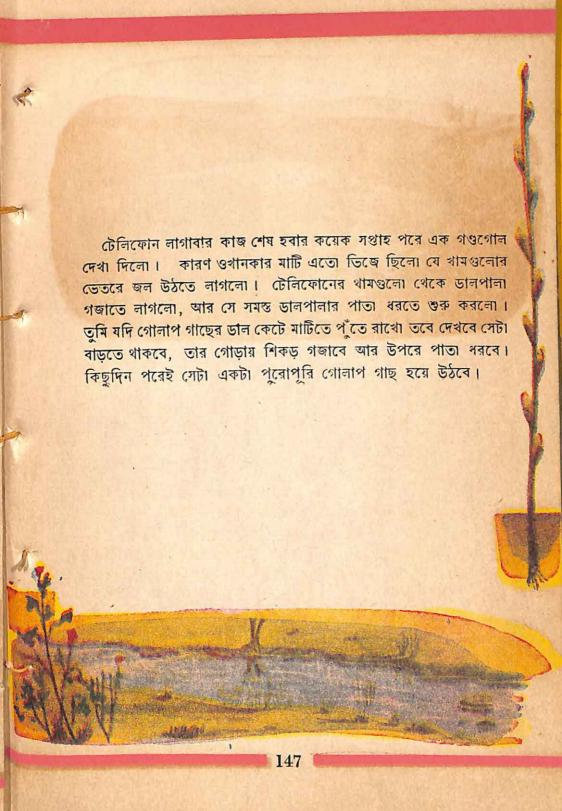
অনেকে ডাঁটার ছোট ছোট টুকরো থেকেও গাছের চারা জন্মায়। এই ছোট ছোট টুকরোগুলোকে বলে 'কাটিং'। কাটিংগুলো প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা হয়। এবং সেগুলোকে শীতকালে বালিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। বসন্তকালে সেগুলো বালি থেকে উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। তখন সেগুলোর নীচের দিকটা থেকে শিকড় আর উপরের দিকটা থেকে ডালপালা গজাতে থাকে।

স্লিপ

বাড়ীতে যে সব গাছগাছড়া থাকে সেগুলোর ডাঁটা সাধারণতঃ নরম হয়। সেগুলোর ডাল কেটে নিয়ে যদি মাটিতে পুঁতে দেওয়া যায় তবে সেগুলিও বড়ো হতে থাকে। এগুলোকে বলে 'স্লিপ'। এগুলোর গোড়ার মাটি যদি ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যায় তবে 'স্লিপ' গুলোও নতুন চারাগাছ হয়ে উঠে।

কোন কোন গাছগাছড়ার 'স্লিপ' সবচেয়ে ভালোভাবে বাড়ে যদি প্রথমে সেগুলিকে জলে রাখা হয়। তখন 'স্লিপ' গুলোর নীচের দিকে শিকড় গজায়।

তারপরে সেগুলোকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়।

মাটির নীচের ডাঁটা
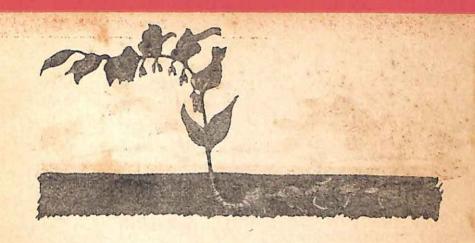
আমেরিকায় 'সোলোমনের শীলমোহর' নামে একরকম উদ্ভিদ আছে। এর বেড়ে উঠার ধরনটা ভারী মজার। আমেরিকার অনেক যায়গার জঙ্গলেই এই উদ্ভিদটা পাওয়া যায়।

প্রতিবছরেই 'সোলোমনের শীলমোহর' মাটির নীচে শিকড় গজায় আর উপরে হাওয়ায় একটা ডাঁটা তুলে দেয়! সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ডাঁটা মাটির নীচে দিয়ে একপাশে মেলে দেয়। পরের বছর মাটির নীচেকার ডাঁটাটার ডগা থেকে শিকড় গজিয়ে নীচে নামে আর একটা নতুন ডাঁটা মাটির উপরে খাড়া হয়ে উঠে যায়। এভাবে উদ্ভিদটা একজায়গা থেকে আর এক যায়গায় যায়। আর প্রতি বছরেই নতুন মাটিতে বেড়ে উঠার ব্যবস্থা করে।

রানার
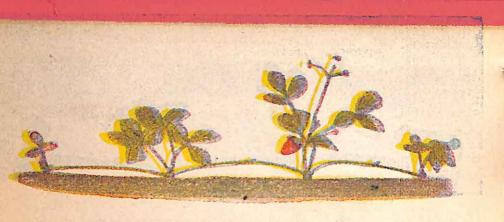
'ষ্ট্রবেরী' জাতীয় উদ্ভিদ তার ডাঁটাগুলো চারপাশে ছড়িয়ে দেয়। সেগুলো যখন মাটি ছোঁয় তখন সেগুলোতে শিকড় জন্মায়, আর শিকড়-গুলোর উপরে পাতা জন্মায়। এভাবে নতুন নতুন চারা জন্মায়। উদ্ভিদের ছড়িয়ে পড়ার এই হ'লো একটা উপায়।

এতো নতুন চারা জন্মায় কেন ?

অল্পকয়েক রকম উদ্ভিদই অনেক দিন বাঁচে। তাদের বেঁচে থাকার পক্ষে অনেকরকম বিঘ্ন আছে বলেই সেগুলো অনেক দিন বাঁচতে পারে না। অনেক চারা গাছ বড়ো গাছের ভীড়ে মারা যায়। অনেক চারাগাছ গোরুছাগলে খেয়ে ফেলে। অনেক চারাগাছ আবার আগুনে পুড়ে যায়। আর কী কী ভাবে চারাগাছ মারা যায় বলতে পারো ?

প্রতি বছরই এভাবে যতো উদ্ভিদ মরে যায় তাদের স্থান পূরণের জন্য নতুন উদ্ভিদের দরকার হয়। প্রতিবছরই যতোগুলি নতুন উদ্ভিদ নানান যায়গায় গজিয়ে উঠে প্রায় ততোগুলি পুরানো উদ্ভিদ মরে যায়। এর দরুণ পৃথিবীতে উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় সমানই থাকে।

একসালা

অনেক উদ্ভিদ শুধু একটা মরশুমে বেঁচে থাকে। সেগুলো বসন্তকালে জন্মাতে থাকে, গ্রীষ্মকালে বেড়ে উঠে বীজ ধরে, তারপর হেমন্তকালে মরে যায়। এমনি অনেক উদ্ভিদ শীতকালে বেড়ে উঠে বীজ ধরে আর শীতের শেষে মরে যায়। এই ধরণের উদ্ভিদকে বলে একসালা উদ্ভিদ। তুমি কতোরকম একসালা উদ্ভিদের নাম বলতে পারো ?

একসালা উদ্ভিদের বীজগুলো মাটিতে পড়ে, আর তার পরের মরশুম অবধি সেগুলো মাটিতেই থাকে। কোন কোন বীজ এমন যায়গায় পড়ে যে যায়গাগুলো বেড়ে উঠার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। আবার কোন কোন বীজ ভালো যায়গায় পড়েনা, অথবা সেগুলোকে জীবজন্তুরা খেয়ে ফেলে।

দু'সালা

দু'সালা দু'বছর বেঁচে থাকে। সেগুলো বসন্তকালে বীজ থেকে জন্মায়। যদি কোন কিছুতে তাদেরকে মেরে বা খেয়ে না ফেলে তবে প্রথম শীতকালটা তারা বেঁচে থাকে। পরের বছর হেমন্তকালে তারা কিন্তু মরে যায়।

গাঁজর ও বীট হ'লো দু'সালা উদ্ভিদ যা আমরা খাওয়ার জন্য জন্মাই। নীচে যে শিয়াল কাঁটার ছবি দেওয়া হ'লো সেটাও দু'সালা উদ্ভিদ।

কৃষকেরা বসন্তকালের গোড়ার দিকে গাঁজরের বীজ বুনে' দেয়। গাজরের চারাগুলো বড়ো হয়ে উঠবার পর সেগুলো তাদের শিকড়ের মধ্যে খাবার জমিয়ে রাখে। হেমন্তকালে কৃষকরা মাটি খুঁড়ে গাঁজরগুলো তুলে ফেলে, তারপর আমরা সেগুলো খাই। বেশীর ভাগ গাঁজরের জীবনাবসান এভাবেই ঘটে। তারা তাদের জীবনের বাকী সময়টুকু বাঁচবার সুযোগই পায় না।

প্রথম শীতকালে গাঁজরগুলোকে যদি মাটিতেই থাকতে দেওয়া হয় তবে পরের বসন্তকালে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। গাঁজর চারার উপর একটা লম্বা ডাঁটা বেরোয়, আর এই ডাঁটাটায় প্রথমে ফুল তারপর বীজ হয়। বীজগুলো পরিণত হবার পর গাঁজর চারাটা নিজে থেকেই মরে যায়---দু'টো মরশুম বেঁচে থাকার পর।

দ্বিতীয় বছরে গাঁজর চারা কেমন করে' বাড়ে তা দেখতে চাও? তবে বাগানে অথবা একটা ফুলের টবে একটা গাঁজর চারা পুঁতে দেখতে পারো। তুমি যদি সেটার যথেষ্ট যত্ন নাও তবে গ্রীষ্মকালে সেটায় ফুল ও বীজ হবে।

বারমেসে

যেসব উদ্ভিদ বছরের পর বছর জন্মায় সেগুলোকে বলে বারমেসে উদ্ভিদ। তাদের শিকড়গুলো মাটিতেই থেকে যায় আর প্রতি বসন্তকালে সেগুলো থেকে ডাঁটা গজায়। শীতের ঠাণ্ডায় তাদের ডাঁটাগুলো মরে' যায় কিন্তু শিকড়গুলো মরেনা। আমাদের বাগানের ফুলগুলোর বেশীর ভাগই বারমেসে। সেগুলো বছর বছর পুরানো শিকড় থেকে গজিয়ে উঠে, নতুন করে' লাগাতে হয়না।
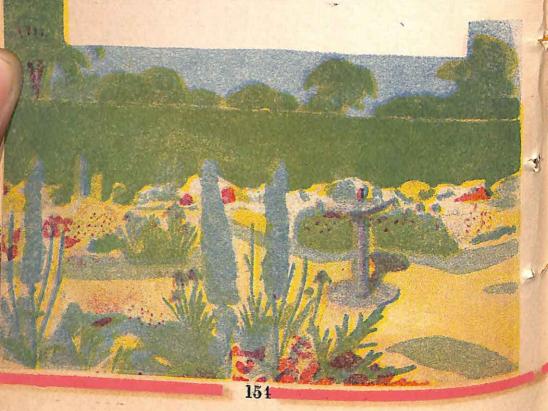
প্রশ্ন

(১) কোন জিনিষ জীবন্ত গোর দেওয়া হয়েছিলো, আর তারপর সে আপনি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছিলো।

(২) বাড়তে শুরু করার সময় শিশু উদ্ভিদরা তাদের খাবার পায় কোথা থেকে?

(৩) তুমি যেখানে থাকো সেখানে বসন্তকালে কোন ফুল সবচেয়ে আগে ফোঁটে।

(৪) প্রতিবছর এতোগুলো করে নতুন উদ্ভিদ জন্মায় কেন?

(৫) 'জনী অ্যাপ্‌লসীড' কী করেছিলো?

(৬) বীজ কী ভাবে বাড়তে শুরু করে?

(৭) টেলিফোনের থামগুলোতে ডালপালা গজাতে শুরু করলো কেন?

(৮) কন্দ থেকে যেসমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় তাদের কয়েকটার নাম করো।

সঠিক উত্তর বলো

(এই বইয়ে না লিখে অন্য কাগজে লেখো)

নীচে যে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ জন্মাবার কথা বলা হয়েছে সে গুলোর প্রত্যেক রকমের জন্য একটা করে উদাহরণ দাও :

(১) বীজ থেকে .... ।
(২) 'রাণার' থেকে .... ।
(৩) 'স্লিপ' থেকে .... ।
(৪) 'কাটিং থেকে .... ।
(৫) কন্দ থেকে .... ।

একসালা উদ্ভিদ বাঁচে .... বছর। তিন রকম একসালা উদ্ভিদ হ'লো :

(১) (২) (৩)

দু'সালা উদ্ভিদ বাঁচে .... বছর। তিন রকম দু'সালা উদ্ভিদ হ'লো :

(১) (২) (৩)

বারমেসে উদ্ভিদ বাঁচে .... বছর অথবা আরো বেশী। তিন রকম বার মেসে উদ্ভিদ হ'লো :

(১) (২) (৩)

উপকারী উদ্ভিদ

Corn
Beets
Carrots
Onions
Beans
Cabbage

পরেশের বাগান

বসন্তকালের শুরুতে পরেশ একটা সব্‌জীর বাগান করতে চাইলো। শুনে ওর বাবা-মা খুব খুসী হলেন। তাঁরা বাড়ীর পেছনের উঠোনটার খানিকটা যায়গায় তাকে বাগান করতে বললেন।

প্রথম প্রথম বাগান করায় পরেশের খুব উৎসাহ ছিলো। সে খুব খেঁটেখুটে মাটি কুপিয়ে বাগানের মাটি বেশ নরম করে' নিলো। তারপর সে লাইন লাইন করে বীজ বুনে' দিলো।

ছোট ছোট চারাগুলো যখন মাটি ফুঁড়ে উঠতে লাগলো তখন খুব মজা লাগলো। কোন কোন চারার ডাঁটার সঙ্গে সঙ্গে বীজগুলোও মাটির উপরে উঠে এলো। অন্যান্য বীজগুলো মাটির নীচেই রয়ে গেলো, সেগুলোর শুধু ডাঁটাগুলো উপরে উঠে এলো।

বসন্তকালের শেষের দিকে আবহাওয়া বেশ গরম হ'য়ে এলো। দেখা গেলো যে পরেশের চারাগুলো আর তাড়াতাড়ি বাড়ছেনা, বাগানটা আগাছায় ভরে' গেছে।

"তোমার বাগানটাকে কিন্তু একটুও ভালো দেখাচ্ছেনা," পরেশের মা বলেন। "তোমার উচিত আগাছাগুলোকে উপড়ে ফেলে' চারাগুলোর চারধারে মাটিতে নিড়নি লাগিয়ে দেওয়া।"

"বাগানে কাজ করতে আর ভালো লাগেনা আমার," পরেশ বলে। "যা গরম পড়েছে আজকাল।"

"কিন্তু কাজটা যখন শুরু করেছো, তখন তো তা শেষ করা উচিত," পরেশের মা বলেন।

"গাছপালা যে কোন কাজে লাগে তা আমি বুঝিনে," পরেশ বলে।

"তুমি কি মনে করো যে গাছপালা না থাকলেও চলে?"

"হ্যাঁ, বাগানে কাজ করার চেয়ে গাছপালার সাহায্য না নেওয়াও ভালো।"

"বেশ, এখন থেকেই তবে শুরু হোক। যদি দেখা যায় যে গাছপালার সাহায্য না নিলেও তোমার চলে তবে তোমাকে আর বাগানে কাজ করতে হবেনা।"

পরেশ হাসে। সে ভাবে যে সে জিতে গেলো। সে একটা চেয়ারে বসতে যায়।

"না, না, চেয়ারে বসা চলবে না," ওর মা চেঁচিয়ে উঠেন। "চেয়ারটা তৈরী হয়েছে কাঠ দিয়ে, আর কাঠতো গাছপালা থেকেই এসেছে।"

"এটা তো আমি ভেবে দেখিনি,' পরেশ বলে।

পরেশ এবারে ঘটীল ট্রাঙ্কটার উপর বসে। সেখানে বসে সে বিশেষ আরাম পাচ্ছিলোনা, তাই দু'মিনিট যেতে না যেতেই সে জিজ্ঞাসা করে, "মা, খাবার তৈরী হ'য়ে গেছে?"

"হ্যাঁ," ওর মা বলেন, "কিন্তু তুমি তো খেতে পাবেনা। গাছ-গাছড়া না হলেও তো তোমার চলে।"

"আমি শুধু মাংস, মাখন আর দুধ খাবো," পরেশ বলে। "সেগুলো তো গাছগাছড়া থেকে আসেনা।"

"সেটা খুব উচিত কাজ হবেনা। মাংস, মাখন আর দুধ জীবজন্তু থেকে আসে বটে, কিন্তু তারা গাছগাছড়া না খেলে তো আর ওগুলো আসতোনা। কাজেই তুমি শুধু নুন আর জল খেতে পারো।"

"আচ্ছা নুন আর জলের সঙ্গে একটু লঙ্কা খেতে পারিনা?"

"না, লঙ্কাও তো গাছগাছড়া থেকেই আসে।"

"তা'হলে আমি বাইরে গিয়ে একটু বল খেলি?"

"না, তাও হ'তে পারেনা। ব্যাট আর বলও গাছগাছড়া থেকেই আসে। তাছাড়া জামাকাপড় পরাও তোমার চলবেনা।"

"কেন ?"

"জুতো ছাড়া তোমার পরণে যাকিছু আছে তা সবই গাছগাছড়া থেকে এসেছে। তোমার জুতো জোড়া যে জন্তর চামড়া দিয়ে তৈরী সেটাও তো উদ্ভিদ খেতো।"

"তা হ'লে আমার মনে হয় শুতে যাওয়াই ভালো," পরেশ বলে। "এছাড়া আর কিছু করা যেতে পারে বলে'তো মনে হয়না।"

"না, শুতেও যেতে পারোনা," ওর মা বলেন। "কারণ বিছানার চাদর, জাজিম ইত্যাদিও গাছগাছড়া থেকেই এসেছে। কম্বলগুলো অবশ্যি পশমের, কিন্তু উদ্ভিদ খেয়ে ভেড়াগুলো যদি না বাঁচতো তবে তাদের পশম আসতো কোথা থেকে ?"

"তাহলে খাবার আগে বাগানে গিয়ে কাজ করাই বোধহয় ভালো হবে, না ?"

"কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম যে তুমি গাছগাছড়া আদপে পছন্দ করো না।"

"না, আমার মত বদলে গেছে," পরেশ বলে। "দেখবে আমি আমার বাগানটাকে সহরের সেরা বাগান করে' তুলবো।

গাছগাছড়ার নানারকম উপযোগিতা

এই বইখানাও উদ্ভিদজাত বস্তু দিয়ে তৈরী। এই কাগজ কোন একসময় জীবন্ত গাছের অংশ ছিলো। বইয়ের পাতাগুলো যে সূতো বাঁধানো হয়েছো তাও এসেছে গাছগাছড়া থেকে। এমন কি ছাপার কালিও গাছগাছড়া থেকে পাওয়া গেছে।

খেলা করবার সময়ও আমরা অনেকরকম উদ্ভিদজাত বস্তু ব্যবহার করি। ক্রিকেট খেলার ব্যাট, রবারের 'বল', দাবার ঘুঁটি---এসমস্তই গাছগাছড়া থেকে তৈরী হয়েছে। ফুটবল ও ক্রিকেট-বলের কোন কোন অংশ গাছগাছড়া থেকে ও কোন কোন অংশ জীবজন্তু থেকে পাওয়া গেছে। কিন্তু উদ্ভিদ না থাকলে যে জীবজন্তুও থাকতো না তা যেন আমরা ভুলে না যাই।

তুমি যদি ঘরের মধ্যেই একবার ঘুরে দেখো তাহলে দেখতে পাবে কতো রকম জিনিষ গাছগাছড়ার দয়ায় পাওয়া গেছে। অনেক জিনিষের উপরেই দেখবে রঙের পালিশ লাগানো হয়েছে। যেসব জিনিষ দিয়ে রঙ তৈরী করা হয় সে জিনিষগুলিও কিন্তু এসেছে গাছগাছড়া থেকেই।

রাজ তুমি যেসব জিনিষ ব্যবহার কর তাদের অনেকগুলিই গাছগাছড়া থেকে এসেছে। খুব সহজেই এসব জিনিষের একটা লম্বা তালিকা তৈরী করা যায়। এমনকি টুপি, সাবান, রবারের জুতাও গাছগাছড়া থেকে তৈরী করা হয়েছে।

উদ্ভিদ-সমাজের তৃণ পরিবার

পৃথিবীতে হাজার হাজার রকমের উদ্ভিদ আছে। তাদের মধ্যে কতগুলো প্রায় একরকম আবার কতগুলো বিভিন্ন রকম। দু'রকম উদ্ভিদ যখন দেখতে অনেকটা একরকমের হয় তখন আমরা বলি যে সেগুলো একই পরিবারের উদ্ভিদ।

আমাদের খাবার জিনিষের বেশীর ভাগই আসে তৃণ পরিবারের উদ্ভিদ থেকে। তৃণ অর্থাৎ ঘাস পরিবারের উদ্ভিদগুলির পাতা লম্বা আর সরু হয়, অনেকরকম ঘাস জীবজন্তুদের খুব ভালো খাবার। যেসব জীবজন্তু খাবার দেয় তাদের প্রায় সবগুলিই ঘাস খেয়ে বাঁচে।

আমরা তৃণ-পরিবারের উদ্ভিদগুলির বীজ খাই। যেসমস্ত ঘাসের বীজগুলো বেশ বড়ো বড়ো হয় তাদেরকে বলা হয় মোটা দানাদার শস্য। গম, জই, মকাই ও যব—এগুলো সবই তৃণ-পরিবারের উদ্ভিদ।
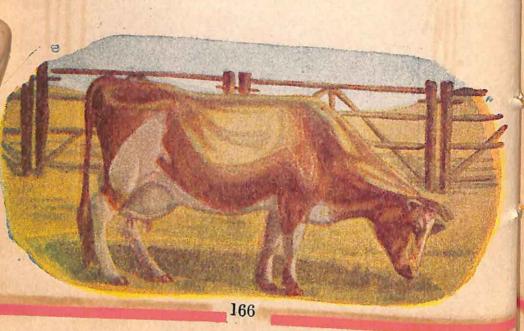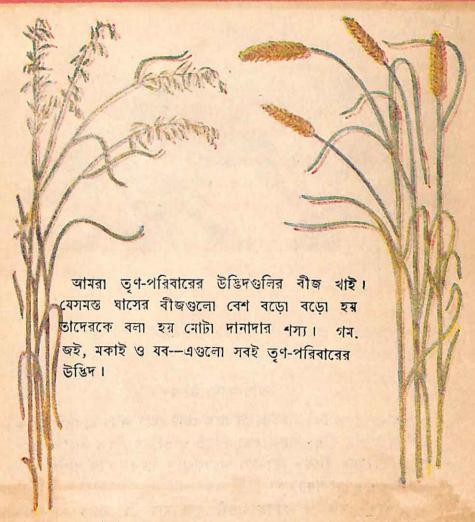
বহু যুগ আগে গম বুনো ঘাসের মতো বনে-বাদাড়ে জন্মাতো। লোকে যখন দেখলো যে গম খাওয়ার পক্ষে বেশ ভালো জিনিষ তখন তারা গমের যত্ন করতে লাগলো বেশী করে। তারা মাটি কুপিয়ে গমের বীজ বুনতে লাগলো, তাতে গমের খুব ভালো ফলন হ'তে লাগলো। আজকাল অন্যান্য গাছগাছড়ার চেয়ে গম থেকেই আমাদের বেশী খাবার আসে।

আঁশওয়ালা উদ্ভিদ

কয়েক রকম উদ্ভিদের বীজের সঙ্গে ছোট ছোট আঁশ লাগানো থাকে। এই আঁশগুলি বীজগুলিকে রক্ষা করতে ও ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। যেসব উদ্ভিদের বীজের চারধারে অনেকগুলো করে' আঁশ থাকে তাদের একটি হ'লো কার্পাস।

কার্পাস থেকে যে কাপড় তৈরী করা যায় তা লোকে অনেকদিন আগে থেকেই জানতো। তারা কার্পাসের গুটি থেকে বীজগুলো বের করে' ফেলে তার আঁশগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে লম্বা সূতো তৈরী করতো। তারপর সেই সূতো দিয়ে কাপড় বুনতো।
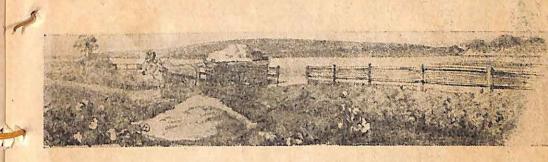
আজকাল এদেশে অনেক কাপাস জন্মায়। যন্ত্র ব্যবহার করে' তুলো থেকে বীজ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর অন্যরকম যন্ত্র ব্যবহার করে' তুলো থেকে সূতো তৈরী করে আবার অন্যরকম যন্ত্রে সূতোগুলোকে বুনে কাপড় তৈরী করা হয়।

পাট আরও একরকমের আঁশজাতীয় উদ্ভিদ। পাটগাছের ডাঁটায় অনেকগুলো শক্ত আঁশ থাকে। এই আঁশগুলো দিয়ে প্রথমে পাটের সূতো তারপর সেগুলো বুনে' চট তৈরী হয়।

কার্পাসের বীজ আর মসিনার বীজ পিষে যে তেল বের করা হয় তা রঙ তৈরীর কাজে লাগে। তেল বের করে' নেবার পর বীজগুলো গুড়ো করে' গরুকে খাওয়ানো হয়।

গাছ

গাছ থেকে মানুষের নানারকম উপকার হয়। প্রায় প্রত্যেক গাছই মানুষের কোন না কোন কাজে লাগে।

যখন মাঠের মধ্যে কোন গাছ জন্মায় আর তার ধারেকাছে যদি অন্য কোন গাছ না থাকে তবে গুড়িটা সাধারণতঃ বেঁটে হয়। সেই গাছই যদি বনের মধ্যে জন্মায় তবে তাকে আলো পাবার জন্য বেশ উঁচুতে উঠতে হয়। এই জন্যই বনের গাছগুলোর গুড়ি এতো লম্বা হয়। বনের গাছ থেকে সবচেয়ে ভালো কাঠ হয়, তাদের গুড়িগুলো লম্বা হয় বলে'।
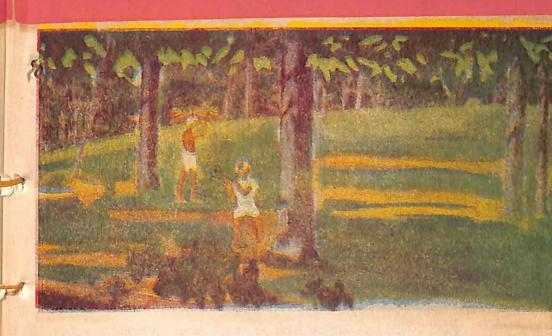
বনের গাছ থেকে আমরা যেসব কাঠ পাই সেগুলোর বেশীর ভাগই বাড়ীঘর আর আসবাবপত্র তৈরী করতে লাগে। টেলিফোনের থাম আর রেলপথের জন্যও অনেক লাগে। আবার কাগজ তৈরী জন্যও প্রচুর গাছ লেগে যায়।

কাঠ পিষে যে সূক্ষ্ম গুড়ো বা মণ্ড পাওয়া যায় তা থেকেই কাগজ তৈরী হয়। কাঠের মণ্ড জলে গুলে' দু'টো বড়ো বড়ো রোলারের মাঝখানে ফেলে চেপে দেওয়া হয়।

বনের গাছ থেকে আরও অনেক জিনিষ তৈরী হয়। বিদেশে 'ম্যাপ্‌ল' গাছ থেকে 'ম্যাপ্‌ল' চিনি তৈরী হয়।

বসন্তকালে প্রত্যেক ম্যাপ্‌ল গাছে কয়েকটা করে গর্ত খোড়া হয়, আর প্রত্যেক গর্তে একটা করে' ধাতুর নল লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর প্রত্যেক নলের মুখে একটি করে' বালতি রাখা হয়। গাছের রস বালতিগুলোতে জমা হয়, তারপর সেই রস প্রকাণ্ড কড়াইয়ে চাপিয়ে জ্বাল দিয়ে ম্যাপ্‌ল চিনি তৈরী করা হয়।

কোন কোন বুনো গাছের পাতা শীতকালে ঝরে' পড়ে যায়। যেসব গাছের পাতা ঝরে' পড়েনা তাদেরকে বলে 'চিরসবুজ' গাছ্। কোন কোন 'চিরসবুজ' গাছে চেপ্টা পাতার বদলে ছুঁচের মতো গোল আর লম্বা পাতা হয়। 'চিরসবুজ' গাছের পাতার ভেতরের রস কোনদিনই জমেনা। তাই চিরসবুজ গাছের পাতা সারা শীতকালেও সবুজ থাকে।

বাগান দেখা

একদিন ছেলেমেয়েরা স্কুলে যখন উদ্ভিদ সম্বন্ধে পড়ছিলো তখন পরেশ ওদেরকে বললো, "আমার বাগানটা দেখবে তোমরা ? আমার বাগানটা কিন্তু সহরের মধ্যে সবচেয়ে সেরা বাগান।"

পরেশ ওদেরকে তার বাগানের উদ্ভিদগুলো সম্বন্ধে বলে। ওরা কৌতূহলী হ'য়ে উঠে, তারপর স্থির করে যে সবাই মিলে বাগান দেখতে যাবে। পরের দিন ওরা সবাই একটা বাসে চেপে উদ্ভিদ আর জীবজন্তু সম্বন্ধে জানবার জন্য বেড়াতে বেরুলো। ওরা প্রথমেই পরেশের বাগানটায় গেলো।

পরেশের বাগানটা সত্যি বেশ ভালো। বাগানটায় একটুও আগাছা ছিলোনা। মাটি বেশ নরম আর সূক্ষ্ম। উদ্ভিদের চারাগুলোকেও বেশ তাজা আর সুস্থ দেখাচ্ছিলো।

"তোমার চারাগুলোকে কোনদিন পোকায় খায়না," বীরু জিজ্ঞাসা করে। "আমাদের বাগানটাতো যতো রাজ্যের পোকায় ভর্তি।"

"আমার বাগানেও যথেষ্ট পোকা ছিলো," পরেশ বলে, "কিন্তু চারাগুলোর উপর বিষ ছিটিয়ে দেবার পর থেকে আর পোকার উৎপাত নেই।"
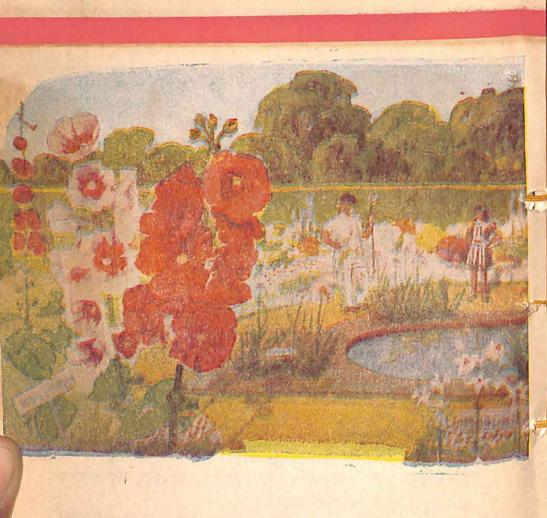
"তোমার বাগানের জমি এতো ভিজে থাকে কি করে?" যতীন জিজ্ঞাসা করে।

"মাটি যখন খুব শুকিয়ে যায় তখন আমি চারাগুলোতে জল দেই যে," পরেশ বলে।

ওরা পরেশকে আরো অনেক প্রশ্ন করলো, পরেশও খুসী হ'য়ে ওদের সব প্রশ্নের জবাব দিলো। পরেশের বাগানটা দেখার পর ওরা একটা ফুলের বাগান দেখতে গেলো।

ফুলের বাগান

ফুলের বাগানটা দেখতে ভারী চমৎকার। সেখানে সব রঙের ফুল আছে, আর প্রত্যেক ফুলের চারার কাছে মাটিতে কাঠি পুঁতে ফুলের নাম লেখা রয়েছে।

''এই ফুলগুলো কি সবই বারমেসে ?'' যতীন জিজ্ঞাসা করে।

''হ্যাঁ,'' বাগানের মালী বলে, ''একসালা ফুলগুলো ফোটার এখনো সময় হয়নি।''

''আমি জানি কেন এরকম হয়,'' তনুকা বলে। ''বারমেসে ফুলের চারার শিকড়ে ওদের খাবার জমা থাকে। এই জন্যই এ ফুলগুলো এতো শীগ্গির শীগ্গির ফুটতে পারে।

''কিন্তু দু'সালা ফুলগুলো কী হ'লো? যতীন জিজ্ঞাসা করে।

''সেগুলো ফোটারও সময় হয়নি এখন,'' মালী বলে। ''সেগুলো যে এখনো ফুটতে শুরু করেনি সেজন্য আমি খুসী। কেন বলতে পারো?''

''পরে গ্রীষ্মকালেও তোমার বাগানে ফুল ফুটবে, এইজন্যই বোধহয়?'' যতীন জিজ্ঞাসা করে।

''হ্যাঁ,'' মালী উত্তর দেয়। ''কোন কোন ফুল যে বারমেসে, কোন কোন ফুল দু'সালা, কোন কোন ফুল একসালা—এটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। এইজন্যই সারা গ্রীষ্মকাল ধরে আমার বাগানে ফুল ফুটতে পায়।''

ওরা মালীকে প্রশ্ন করে' আরও অনেক বিষয় জেনে নেবার পর আবার বাসে চেপে রওনা হয়।

বুনো ফুল

একটা মস্তবড়ো বনের ধারে একটা ছোট পার্কের কাছে ওদের বাসটা এসে দাঁড়ালো।

"বাঃ, দেখোনা একবার বুনো ফুলগুলোর পানে তাকিয়ে!" বীরু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে। "আমরা কি ওগুলো তুলতে পারি?"

"তা বলতে পারিনে," যতীন বলে। "ওখানে যে পুলিশটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে জিজ্ঞাসা করা যাক।"

"আমি জানি যে পার্কের ভেতর আমরা ফুল তুলতে পারিনা," বীরু বলে। "কিন্তু বনেও তো কতোরকম ফুল ফুটে আছে, ওখানে হয়তো কিছু কিছু ফুল তোলা যায়। মায়ের জন্য কিছু ফুল বাড়ী নিয়ে যেতে ভারী ইচ্ছা করছে আমার।"

পুলিশটা ওদেরকে বলে যে কোন কোন বুনো ফুল তোলা আইনে বারণ আছে। কোন কোন ফুল তোলা আইনে বারণকরা হয়েছে সে ওদেরকে সেগুলো দেখিয়ে দেয়।
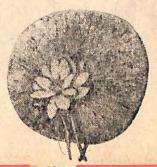
"আমার মনে হয় বুনো ফুলগুলো এতো সুন্দর যে সেগুলো তোলা উচিত নয়," তনুকা বলে। "তাছাড়া চারা থেকে সব ফুল তুলে' নিলে সেগুলোতে আর বীজ হ'তে পারেনা।"

"বুনো ফুলগুলো খুব তাড়াতাড়ি কুঁকড়েও যায়," পরেশ বলে। "গাছ থেকে ছিড়ে নেবার অল্পক্ষণ পরে সেগুলো আর আগের মতো সুন্দর থাকে না।

"আমার মনে হয় বুনো ফুল একেবারে না তোলাই ভালো," মণিকা বলে। "ওরা যেখানে জন্মাচ্ছে সেখানেই ওদেরকে বেশী সুন্দর দেখায় ওদেরকে গাছ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া মোটেই ভালো কাজ হবেনা। ওরাতো নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না।"
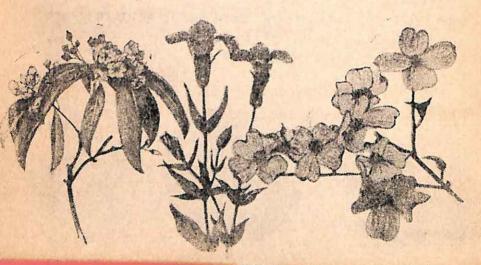
উদ্ভিদের আত্মরক্ষা

"নিশ্চয় পারেনা। উদ্ভিদ নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন কথা কে কবে শুনেছে?"

"এখানে কিন্তু একটা উদ্ভিদ আছে যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে," পরেশ একটা দুর্গন্ধ বুনো কপির চারার দিকে এগিয়ে যেতে বলে।

"এটাকে তো বিশেষ মারাত্মক বলে' মনে হচ্ছেনা," বীরু বলে।

"একটু শুঁকেই দেখোনা," পরেশ বলে।

"উঃ, কী বিশ্রী গন্ধ!" বীরু বলে। "আমার মনে হয় কোন জানোয়ারও এটা খেতে চাইবে না।"

"যেসব উদ্ভিদ নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে তাদের আরও কয়েকটা খুঁজে দেখা যাক," তনুকা প্রস্তাব করে।

ওরা প্রথমেই খুঁজে বের করলো একটা বিষাক্ত আইভি লতা। এর পাতাগুলো উজ্বল সবুজ রঙের। সেটা ওরা কেউ ছুলোনা।

আরও অনেক রকম উদ্ভিদের মধ্যেও বিষ থাকে। সেই বিষের ভয়ে কোন জীবজন্তু সেগুলিকে খায়না। মানুষও সেগুলি থেকে দূরে থাকে।

সারা গায়ে কাঁটা গজিয়েও অনেক রকম উদ্ভিদ নিজেদেরকে রক্ষা করে। কাঁটাগুলো এতো ধারালো যে কোন জীবজন্তুই সেগুলিকে খেতে পারেনা। বুনো গোলাপ, বুনো কালোজাম এবং আরও অনেক অনেক রকম উদ্ভিদের কাঁটা থাকে।

বড়ো উদ্ভিদগুলোর বেশী ভাগেরই গুড়ি ও ডালগুলো কাঠের। কাঠগুলো এতো শক্ত আর তার পাতাগুলোকে এতো উঁচুতে ধরে' রাখে যে বড়ো বড়ো জীবজন্তুরাও সেগুলোর নাগাল পায় না।

এভাবে বাগানে বাগানে বেড়াতে ওদের খুব মজা লাগলো। ওরা অনেক রকম উদ্ভিদের নাম জানলো। ওরা দেখলো কোন উদ্ভিদ কোন-খানে থাকে আর কী করে' তারা নিজেদেরকে রক্ষা করে।

বাগানে বাগানে ঘোরার পালা শেষ করে' ওদেরকে নিয়ে বাসটা যখন ফিরে এলো তখন ওদের রীতিমতো দুঃখ হচ্ছিলো।

বীরু বললো, "আমার ইচ্ছা করে রোজ এমনি করে বাগানে বেড়াতে যাই। উদ্ভিদ দেখতে যে এতো মজা লাগে তা আমার জানা ছিলোনা। আমি উদ্ভিদ সম্পর্কে আরও পড়াশুনা করবো।"
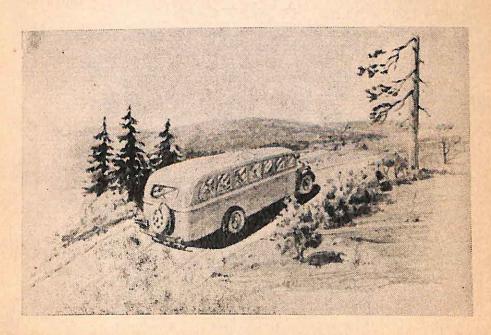
যা করতে হবে

(১) উদ্ভিদ কী কী কাজে লাগে তার একটা তালিকা তৈরী করো।
(২) নানারকম আঁশওয়ালা উদ্ভিদ সংগ্রহ করো।
(৩) নানারকম কাপড় যোগাড় করো। কোনরকম কাপড় কীরকম আঁশ দিয়ে তৈরী তা বের করো।
(৪) কীভাবে কাগজ তৈরী করা হয় সে সম্বন্ধে আরো বেশী জানতে চেষ্টা করো।
(৫) বিভিন্ন রকম আগাছা তুলে' সেগুলিকে ফুলের টবে পুঁতে রাখো। তাদের নামগুলো জেনে নাও।
(৬) কোন কোন রকম বুনো ফুল তোলা আইনে বারণ তা দেখিয়ে একটা প্রাচীরপত্র তৈরী করো।
(৭) নানারকম ফুল সম্বন্ধে জানবার জন্য বাগানে বাগানে বেড়াতে যাও।
(৮) বীজ বুনে' মনসাসিঁজ জাতীয় উদ্ভিদের বাগান করো।
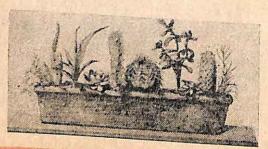
প্রশ্ন

(১) তুমি যে প্রদেশে থাকো সেখানে কোন কোন রকমের বুনো ফুল তোলা আইনে বারণ ?

(২) বুনো ফুল রক্ষা করতে তুমি কী ভাবে সাহায্য করতে পারো ?

(৩) মালীরা সারা গ্রীষ্মকাল ধরে' বাগানে ফুল ফোটায় কী করে ?

(৪) কোন কোন ফুল তোলা আইনে বারণ কেন ?

(৫) কী কী উপায়ে উদ্ভিদরা নিজেদেরকে রক্ষা করে ?

(৬) উদ্ভিদের উপকারিতার একটা কারণ বলো।

(৭) উদ্ভিদদের অপকারিতার একটা কারণ বলো।

(৮) কোন কোন উদ্ভিদকে তোমার সবচেয়ে উপকারী বলে' মনে হয় ? সেটাকে সবচেয়ে উপকারী মনে হয় কেন ?

সঠিক উত্তর বলতে পারো

(এই বইয়ে না লিখে অন্য কাগজে উত্তর লেখো)

(১) এখানে কতগুলো উদ্ভিদের নামের তালিকা দেওয়া হ'লো। এদের কোনটা নীচের কোন খালি যায়গায় বসবে তা বের করো: 'ডগউড' গাছ, বিষাক্ত আইভি লতা, দুর্গন্ধ কপি, লেডি স্লিপার, যব, পাট।

..............................র গন্ধ অতি বিশ্রী।
.... তৃণ-পরিবারের উদ্ভিদ।
.... গাছে ফুল ধরে।
.... আঁশওয়ালা উদ্ভিদ।
.... একটি বিষাক্ত উদ্ভিদ।
.... ফুল তোলা আইনে বারণ।

(২) কার্পাসের বীজ থেকে কী তৈরী হয়?
(৩) ম্যাপ্‌ল চিনি কী করে তৈরী হয়?
(৪) 'চিরসবুজ' গাছ কী?
(৫) কাপড় তৈরী করা হয় কোন কোন উদ্ভিদ থেকে?

স্বাস্থ্যরক্ষা

সমাজের অনেক লোক তোমাকে স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করে। ওদের ক'জনকে তুমি জানো ?

তোমার হয়তো সকলের আগে তোমাদের ডাক্তারের কথা মনে হবে। তোমার যখন অসুখবিসুখ হয় তখন তিনি তোমায় দেখতে আসেন। তুমি গুরুতর আঘাত পেলে কী করতে হ'বে তা তিনি জানেন। তোমার যদি খুব বেশী অসুখ করে তবে তিনি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে' দেবেন।

এছাড়া আরও অনেক উপায়ে ডাক্তার তোমাকে সাহায্য করতে পারেন। প্রতি বছরই একবার করে ডাক্তারকে দিয়ে তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত। এরকম করলে ডাক্তার বলে' দিতে পারবেন কী করলে তোমার আদপে কোন অসুখ হবে না।
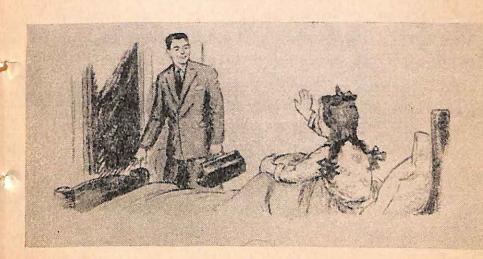
আমি দাঁতের ডাক্তার। তোমরা যদি দাঁতের যত্ন না নেও তবে কিন্তু আমি তোমাদের দাঁত তুলে' ফেলবো। যদি তোমাদের সব দাঁত তুলে' ফেলতে হয় তবে আমি তোমাদেরকে নকল দাঁত বানিয়ে দেবো।

তবে দাঁতগুলো তুলে ফেলার চেয়ে সেগুলো যাতে বজায় থাকে আমি তার জন্যই বেশী চেষ্টা করবো। তোমরা যদি প্রতি ছয় মাসে একবার করে' আমার কাছে আসো তবে আমি তোমাদের দাঁতগুলি ভালো করে দেখতে পারি। যদি দাঁতে গর্ত হ'য়ে থাকে তবে গর্তগুলো ভরাট করে' দেবো। গর্তগুলো খুব বড়ো না হ'য়ে থাকলে এতে একটুও ব্যথা লাগবে না।

আমি তোমাদের দাঁত পালিশ করে' পরিষ্কার ঝকঝকে করে' দিতে পারি। দাঁত যাতে অনেকদিন সেরকম থাকে সেজন্য কী ভাবে বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজতে হয় তাও আমি বলে দিতে পারি।

আমি দমকলের লোক। অবশ্যি আমি দমকলের গাড়ীতেই চড়তে ভালোবাসি। তা হ'লেও বলবো যে, যেবাড়ীতে তুমি থাকো সেখানে যদি আগুন লাগে তবে আগুনটাকে মোটেই মজার ব্যাপার বলে' মনে হবেনা তোমার।

যদি কোথাও আগুন লাগে তবে আমরা সকলের প্রথমে দেখে নেই সে বাড়ীতে কোন লোক আছে কিনা। যদি থাকে তবে আমরা ভেতরে ঢুকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসি। কখনো কখনো আমরা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে মই দিয়ে তাদের নামিয়ে আনি। আমরা দমকলের লোকেরা জানি লোকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশী ধোঁয়া টেনে নিয়ে থাকলে তাদের কী করে যত্ন নিতে হয়। আগুনে কারো গা পুড়ে গিয়ে থাকলে কী করতে হয় তাও আমাদের জানা আছে।

দিনে রাত্রে যে কোন সময় আগুন নেবাবার জন্য দমকলের লোকদের তৈরী থাকতে হয়। যখনই দমকলের গাড়ীর আওয়াজ শুনতে পাবে তখনই রাস্তা ছেড়ে দিও।

আমি স্কুলের নার্স। তোমার যদি শরীর ভালো না লাগে কিংবা কোন-রকম দুর্ঘটনা হয় তবে যতো তাড়াতাড়ি পারো আমার কাছে চলে' এসো। আমি যতোটা পারি তোমাকে সাহায্য করবো।

স্কুলের নার্স হ'বার আগে আমি হাসপাতালে কাজ করতাম। সেখানে আমি শিখেছি কী রকম দুর্ঘটনায় কী করতে হয় আর অসুখ হ'লে কী করে লোকদের যত্ন নিতে হয়।

ডাক্তার আর দাঁতের ডাক্তারের মতো আমিও স্বাস্থ্যরক্ষায় তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমি তোমার স্বাস্থ্যের রেকর্ড রাখি এবং তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন কিছু করার দরকার হয় তবে আমি তোমার অভি-ভাবককে চিঠি লিখে তা জানিয়ে দি'। তখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের বাড়ীর ডাক্তার তোমাকে দেখেন।

আমি জঞ্জাল সাফ্ করি। আমার কাজ তোমার স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে খুব জরুরী। একবার ভেবে দেখোতো কেউ যদি জঞ্জাল সাফ না করতো তবে তোমাদের কী হ'তো ?

জঞ্জাল যদি কয়েকদিন ধরে' পড়ে থাকে তবে মাছিরা সেগুলোর উপর ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে আরও অনেক মাছি বেরিয়ে তোমাদের খাবার জিনিষে বসে' সেগুলো নোংরা করে' দিতে পারে। এভাবে নানারকম রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

জঞ্জালের টিনের উপরটা সব সময় ঢেকে রেখো, সবরকম জীবজন্তুকে বাইরে রেখো। তাহলে আমি জঞ্জালগুলো সরিয়ে ফেলে তোমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করতে পারি।
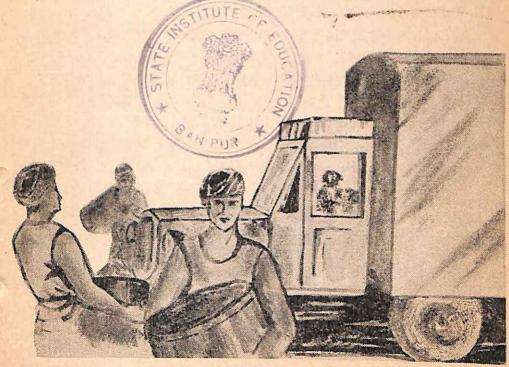
আমার খাবারের দোকান আছে। তোমরা যখন খাবার কেনো তখন আমি দেখি খাবারগুলো যাতে তাজা আর নিরাপদ থাকে।

আমি যেসব খাবার বিক্রী করি তাদের কোন কোনটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এই ধরণের খাবার আমি বড়ো বড়ো 'রিফ্রিজারেটারে' ভরে' রাখি। আশাকরি সেগুলো বাড়ী নিয়ে গিয়ে তোমরাও 'রিফ্রিজারেটারে' ভরে' রাখো। ওরকম না করলে কিন্তু সেগুলো নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে।

তোমরা যেসমস্ত খাবার কেনো সেগুলো যাতে নিরাপদ থাকে সেজন্য আমি আমার দোকান খুব পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করি। জিনিষগুলো বিক্রী করার সময় আমি সেগুলো পরিষ্কার ঠোঙায় ভরে দি'। আমার দোকানের খাবার থেকে তোমাদের কোন রোগ হয় সে আমি চাইনে।

"আমার কথা ভুলোনা," পুলিশম্যান বলে। "আমিও তোমাদেরকে নিরাপদ রাখতে চেষ্টা করি। আমি যেখানে দাঁড়াই তোমরা যদি সেখানে রাস্তা পার হবার চেষ্টা করো তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যাতে তোমরা আঘাত না পাও।"

প্রতি চৌমাথায় রাখবার মতো যথেষ্ট পুলিশম্যান নেই বলে' কোনো কোন কোন চৌমাথায় তোমাদেরকে সতর্ক করে' দেবার জন্য শুধু লাল, হলুদ ও সবুজ আলো রাখা হয়েছে। কোন কোন চৌমাথায় আবার তাও নেই। যে কোন রাস্তা পার হবার আগে দু'দিকেই দেখে নিও।
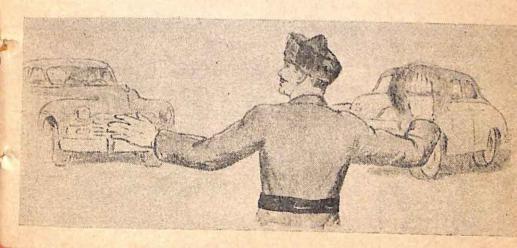
সমাজে আরও অনেক লোক আছে যারা তোমার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। যতো দূর পারো তাদের একটা লম্বা তালিকা তৈরী করো।

তোমার তালিকা তৈরী করার সময় পশুর ডাক্তারের কথা মনে রেখেছিলে তো? পশুর ডাক্তার তোমাদের পোষা জীবজন্তুগুলোর অসুখ হ'লে তাদেরকে সাহায্য করে। রুগ্ন জীবজন্তুর দুধ খেলে আমাদেরও ঐসব রোগ হ'তে পারে।

আমরা যে মাংস বাজার থেকে কিনে আনি সেগুলো যাতে নিরাপদ থাকে পশুর ডাক্তার তাও দেখে থাকেন।

যারা আমাদের ব্যবহারের জল নিরাপদ রাখে তাদের কথাও মনে ছিলো তো? যে জল নিরাপদ নয় তা নানারকম রোগ নলের মধ্য দিয়ে একেবারে আমাদের বাড়ীতে বয়ে' নিয়ে আসে। তাই এরা দেখে যে আমাদের পানীয় জল যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।

জলের কল আর ইলেকট্রিক মিস্ত্রীদের কথাও মনে ছিলো তো? ভেবে দেখো তো এরা যদি আমাদের জলের কল আর ইলেকট্রিকের তার ঠিক করে' না দিতো তবে কী হ'তো।

টীকা

নয়খানা বই নিয়ে একটি পাঠমালার তৃতীয় খণ্ড এই বইখানা। শিশুরা তাদের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে যেভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে সেই অনুক্রম যথাসম্ভব বজায় রেখেই এই বইয়ের উল্লিখিত কাজকর্ম, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সাজানো হয়েছে। এই পাঠমালা রচনার সময় সর্বদাই মনে রাখা হয়েছে যে বিজ্ঞানের বিচিত্র জগৎ শিশুদের কাছে এক চির-নুতন অভিজ্ঞতার জগৎ, এবং শিশুদের কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ সঠিকভাবে জাগিয়ে তুলতে পারলে তাদেরকে একদিন বিজ্ঞান-রসের প্রকৃত আস্বাদনের অধিকারী করা যাবে। রচয়িতাদের বিশ্বাস যে সত্যের আকর্ষণ দুর্বার এবং তা যেসমস্ত শিশু বিজ্ঞান-জগতের চির-নুতন ব্যাপারগুলির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে তাদের মনে সত্যিকারের উৎসাহ জাগিয়ে তোলা। রচয়িতারা একথাও বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞান-শিক্ষা শিশুদেরকে তাদের ভবিষ্যত সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

এই পাঠমালার প্রত্যেকখানা বই যে বয়সের শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট সেই বয়সের শিশুদের পক্ষে সহজবোধ্য ভাষায় লেখা হয়েছে। এজন্য এদের পাঠগুলোতে যথাসম্ভব শব্দ ব্যবহারে চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া সযত্নে বাছাই করে' এমন সব ছবি এগুলোতে দেওয়া হয়েছে যা আশা করা যায় পাঠগুলোকে বুঝতে সাহায্য করার এবং শিশুদেরকে বিজ্ঞান-শিক্ষা দেবার ব্যাপারে এই পাঠমালাকে বিশেষ ফলদায়ক করে' তুলবে।

বর্ত্তমান তৃতীয় খণ্ড লেখা হ'লো সেই সব শিশুদের জন্য যাদের বয়স দশ বছরের কাছাকাছি। এর বিষয় নির্বাচনও সেই অনুযায়ীই করা হয়েছে, এবং আশা করা যায় এর ভাষাও এই বয়সের শিশুদের মান উপযোগীই সহজ রাখতে পারা গেছে। যতদূর সম্ভব এতে যুক্তাক্ষর ও কঠিন শব্দাদির প্রয়োগ বর্জন করার চেষ্টা করা হয়েছে ; তবে কতগুলো নাম ও বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার এড়ানো সম্ভব হয়নি।

রচয়িতারা প্রত্যাশা করেন যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়াবার সময় শিশুদের সামনে এমন ধরণের সহজ পরীক্ষা করে দেখাবেন যা বিজ্ঞানে তাদের কার্য্যকরী আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

আমাদের এই বিশাল দেশে সব অঞ্চলের আবহাওয়া, গাছপালা, পশুপাখী ইত্যাদি এক রকম নয়। খুবই সম্ভব যে এই বইয়ে যেসমস্ত গাছপালা, পশুপাখী ইত্যাদির ছবি দেওয়া হয়েছে তা দেশের কোন কোন অংশে পাওয়া যায়না। তবুও এটা অনস্বীকার্য্য যে এসমস্ত ছবির মধ্য দিয়ে যে জ্ঞান লাভ হবে তা দেশের সকল অংশের শিশুদের পক্ষেই সমান উপকারী হবে।

পৃ : 5—30

বইয়ের এই অংশে ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক যেক'টি বৈজ্ঞানিক সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হ'লো :

(ক) আমরা আমাদের খাবার পাই কোথা থেকে?

(খ) উদ্ভিদ তার খাবার পায় কোথা থেকে?

(গ) উদ্ভিদ কোথায় কোথায় খাবার জন্মায়?

(ঘ) উদ্ভিদ তার বীজ ছড়িয়ে দেয় কী ভাবে?

পৃঃ ৬-৭ : খামারের দৃশ্য খাবার সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি করবে, আর গ্রীষ্মকালে যতীনের শরীর যেভাবে বেড়েছে তার সঙ্গে ভালো খাওয়া-দাওয়া ও ঘরের বাইরে শারীরিক পরিশ্রমের নিবিড় সম্পর্ককেও উদ্‌ঘাটিত করবে। ছবির মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রীপার, ট্রাকটর, এক বোঝা খড়, 'সাইলো' এবং গোলাঘর।

৮ : সব ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়ই ছোট হ'য়ে যায়।

৯ : যতীনকে মাপা ও ওজন করা। ছেলেমেয়েরা রুলার ও স্কেল দিয়ে এসব করতে পছন্দ করে।

১০ : যতীন খামারে যেসব কাজ করতো সব ছেলেমেয়েরাই সেসব কাজ করতে ভালোবাসে। ওদের প্রত্যেককে বলুন কে কী কাজ করেছে তা বলতে।

১১ঃ খামার থেকে আমরা খাবার পাই কী করে? বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার এটা খুব সুবর্ণ সুযোগ।

১২-১৩ঃ মিঠা-জল ও নোনা-জল থেকে যেসব জান্তব খাবার পাওয়া যায়।

১৪-১৫ঃ ছেলেমেয়েদেরকে লাইব্রেরীর বই ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন। ওদেরকে বলুন ভাঁজা চিনাবাদাম পিষে বাদামী মাখন তৈরি করতে।

১৬-১৭ঃ চকোলেট আর কলা ছেলেমেয়েদের অতি প্রিয় খাবার। এই সুযোগে বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভূগোলের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

১৮-১৯ঃ 'টেরারিয়াম' তৈরি করতে ছেলেমেয়েদের বেশ মজা লাগবে। ''ওয়াণ্ডরিং জু'' উদ্ভিদের পাতার নীচের দিকটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে তার 'সেলগুলোর গঠন ও 'স্টোমাটা' দেখা যাবে। 'স্টোমাটা'কে বইয়ে 'মুখের মতো দেখতে ছোট ছোট গর্ত বলা হয়েছে''।

২০ঃ শিকড়গুলো যে জলের দিকে বাড়ছে সেদিক লক্ষ্য করতে বলুন।

২১ঃ ছবিতে 'বেগোনিয়া' দেখানো হয়েছে। পাতাগুলো ডাঁটার মধ্য দিয়ে জল পায়।

২২ঃ মাটি-জল যখন শুকিয়ে যায় তখন খনিজ পদার্থের একটা সূক্ষ্ম পর্দা পড়ে থাকে। গ্লাসটা আলোতে ধরলে এটা আরও ভালো-ভাবে দেখা যায়।

২৩ঃ হাওয়া প্রধানতঃ পাতার মধ্য দিয়েই উদ্ভিদের শরীরে ঢোকে। খনিজ পদার্থ সমেত জল ঢোকে শিকড়ের মধ্য দিয়ে। উদ্ভিদের খাবার সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ পাতার মধ্যে তৈরী হয়।

২৪ঃ গাজর, বাঁধা কপি (বেশীর ভাগই পাতা), শাক। ছেলে-মেয়েদেরকে বাঁধা কপির অথবা শাকের পাতা গুণতে বলুন।

২৫ঃ 'লিমা' শুঁটির বীজ, ভুট্টার বীজ। ছেলেমেয়েদেরকে বড়ো বীজের মধ্যে শিশু উদ্ভিদগুলোকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করুন।

২৬-২৭ঃ ২৬পৃষ্ঠার বাঁদিকেঃ শিঙ্গল্ ওক, বীচ, ম্যাপ্ল্ বীজ। ছবিতেঃ ওক গাছ। কানাডার হাঁস উড়ছে, পাতিহাঁস জল থেকে উঠছে, মিল্কউইড, খরগোশ।

২৭ পৃষ্ঠায় ডানদিকেঃ ড্যানডেলিয়ন, কাঁটাগাছ৷ মিল্কউইড বীজ।

২৮ঃ লম্বালম্বিভাবে ও আড়াআড়িভাবে কাটা গাজর, পিঁয়াজ, শিকড়সুদ্ধু ঘাস, ব্রেজিল বাদাম, ২ ফিলবার্ট বাদাম, ১ বুনো পেকান, বাদাম, বিলাতী বাদাম, শুঁটী, স্থই গম, ভুট্টা, 'লিমা' শুঁটি, মটর, পীচ।

২৯ঃ সঠিক উত্তর হ'লো (১) উদ্ভিদ (২) জল (৩) শিকড় (৪) বীজ "তুমি কি জানো?" (১) হাওয়া, জীবজন্তু গায়ে লেগে, জীবজন্তুদের দ্বারা, জলের দ্বারা। (২) হাওয়া, জল, খনিজ পদার্থ (৩) শিকড় ডাঁটা আর পাতা (৪) শিকড়, ডাঁটা, পাতা বীজ (৫) যে তিন উপায়ে উদ্ভিদ আত্মরক্ষা করে তা হ'লো (ক) কাঁটা (খ) বিষ (গ) কর্কশতা।

৩০ঃ প্রশ্নগুলির উত্তর (১) উদ্ভিদ (২) বেশীর ভাগই সবুজ (৩) জল ও খনিজ পদার্থ (৪) পাতাগুলো উদ্ভিদের খাবার তৈরি করে (৫) জলের সঙ্গে মাটির খনিজ পদার্থ মিশিয়ে যে জল হয় (৬) পাতার মধ্যে যেসব ছোট ছোট গর্ত থাকে সেগুলো দিয়ে উদ্ভিদ হাওয়া টেনে নেয় (৭) মানুষ উদ্ভিদের পাতা, ডাঁটা, শিকড় ফল ও বীজ খায় (৮) পাতা খাবার তৈরী করে (৯) যতোদিন না সে নিজে খাবার তৈরী করতে পারে ততোদিন শিশু-উদ্ভিদ জমানো খাবার ব্যবহার করে।

(১০) বীজগুলো তাদের বাড়বার জায়গা নিজেরা খুঁজে নিতে পারে না। সেগুলো যখন কোন জায়গায় পড়ে বা কোন জায়গায় পুঁতে দেওয়া হয় তখনই বাড়তে পারে।

পৃঃ 31—60

পৃথিবীর পরিবর্তন

বইয়ের এই অংশে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলোর সাহায্যে ছেলেমেয়েরা নীচের বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবেঃ

(ক) পৃথিবীতে কী কী পরিবর্তন ঘটছে ?

(খ) কী কী কারণে পৃথিবীর উপরিভাগ কোন কোন জায়গায় ক্ষয়ে যাচ্ছে ?

(গ) কী কী কারণে পৃথিবীর উপরিভাগ কোন কোন জায়গায় গড়ে উঠছে ?

শরৎকালে নানারকম পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় বলে ছবিগুলো শরৎকালের দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা হয়েছে। বইয়ের এই অংশেও বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে।

৩২-৩৩ : কুমড়ো ইত্যাদি যেসব জিনিস শরৎকালে দেখা দেয় সেগুলি নিয়ে শরৎকালের একটি দৃশ্য। ছেলেমেয়েদেরকে ছবিটা ভালো করে দেখতে দিন। শরৎকালে ওরা যেসমস্ত জিনিস দেখেছে সেগুলো সম্বন্ধে বলতে ওরা উৎসাহ বোধ করবে।

৩৪-৩৫ : উপরে : কানাডার পাতিহাঁস ও হাঁস, ছোট বুনো ফাঁস, আফ্রিকার হাঁস, জলার ঘাস।

৩৮-৩৯ : জলপ্রবাহের শক্তি ও বিপদ দেখিয়ে একটি বন্যার দৃশ্য। এখানে সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার সুযোগ আছে।

৪২-৪৩ : ধূলোঝড়ের পরে—হাওয়ার প্রবাহ যে পরিবর্তন ঘটতে পারে তার প্রমাণ।

৪৪ : একটি আলোক-স্তম্ভ ও সাগরের ঢেউ। সমুদ্রের ঢেউ কী করে জমির উপরিভাগের পরিবর্তন ঘটায় তা ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে বা দেখে থাকবে।

৪৬-৪৭ : ছবিতে দেখা যাচ্ছে নদী কাদা-জল সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাদা-জল আর সমুদ্রের পরিষ্কার জলের প্রভেদ রেখাটা লক্ষ্য করতে বলুন।

৪৮ : চেয়ার ডেস্ক ইত্যাদিতে যে ধূলো পড়ে থাকে বা দরজা-জানালার ফাঁকে দিয়ে যে রোদের ফালি আসে তাতেও যে ধূলো উড়ে তা ছেলেমেয়েরা দেখেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ধূলোর নীচে চাপা পড়া একটা শহরকে মাটি খুঁড়ে আবার আবিষ্কার করা হচ্ছে।

৪৯ : যেসমস্ত জীবজন্তু থেকে চা-খড়ি হয়। চা-খড়ি গড়ে উঠতে যে অনেক সময় লাগে তা ভালো করে' বুঝিয়ে দিন।

৫০-৫১ : অধুনালুপ্ত গুহাবাসী ভালুক ও অতিকায় জানোয়ার সমেত তুষারস্রোতের ছবি। শেষ তুষারস্রোত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে আবৃত করেছিলো। গ্রেট লেকগুলি ও অন্যান্য জিনিষ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫৪-৫৫ : মানুষের হাতে পৃথিবীর পরিবর্তনের ছবি। এখানেও সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার অনেক সুযোগ আছে।

৫৬-৫৭ : বালির টেবিলের সাহায্যে কী করে' ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যায় ছবিতে তা দেখানো হয়েছে।

৫৮-৫৭ : প্রস্তাবিত কাজকর্ম সম্পর্কে কয়েকটি ছবি।

৬০ : "বলতে পারো ?" : উত্তর (১) লাভা (২) বেলেপাথর (৩) চুনাপাথর (৪) মেটেপাথর (৫) মাধ্যাকর্ষণ (৬) তুষারস্রোত।

"তিনটে জিনিসের নাম বলো (যা জমি গড়ে তোলে)। উত্তর : (১) জল (২) হাওয়া (৩) আগ্নেয়গিরি। (যাদের দরুন জমি ক্ষয়ে যায়) : (১) জল (২) হাওয়া (৩) তুষারস্রোত।

তাপ, পৃঃ 61 – 82

আগুন লাগা ও ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে শুরু করে' এই অংশে নিম্ন লিখিত সমস্যা দু'টিকে কেন্দ্র করে তাপ সম্বন্ধে নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

(ক) আগুন কী করে লাগে ?

(খ) মানুষ আগুন সম্বন্ধে জানলো কী করে ?

(গ) আমরা কী কী উপায়ে তাপ পেতে পারি ?

(ঘ) কোন জিনিষ কতোখানি গরম তা আমরা কী করে জানতে পারি ?

(ঙ) তাপ এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় কী করে যায় ?

(চ) জামাকাপড় আমাদেরকে গরম রাখে কী করে ?

৬২-৬৩ : এখানে আগুন যাতে না লাগতে পারে সেসম্বন্ধে শিক্ষা দেবার সূত্রপাত করা যেতে পারে।

৬৪ : সোনালী মাছ রাখবার কাচের পাত্রটা বিবর্ধন কাচ হিসেবে কাজ করেছিলো।

৬৭ : যে কোন রকম ঘর্ষণ থেকেই তাপ জন্মায়।

৬৮ : ছেলেরা তুরপুন তৈরী করার কাজটা পছন্দ করবে।

৬৯ : ছেলেমেয়েদের তাপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাগুলোকে শ্রেণী অনুসারে সাজাতে বলুন।

৭৩-৭৫ : এই পরীক্ষাগুলির উপলক্ষ্যে সঠিকভাবে অর্থাৎ থার্মো-মিটারের সাহায্যে তাপ মাপবার প্রয়োজন বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

৭৬ : তাপের বিকিরণ বুঝিয়ে দেবার সময় নিরাপত্তার জন্য বিজলী বাতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭৭ : এখানেও একটি ছোট বিজলী বাতি আর একটা ড্রাই সেল ব্যাটারী ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭৯ : ছবি — এস্কিমো ও তাদের বরফের ঘর। "প্রশ্ন" গুলির আলোচনার সূত্রপাত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮২ : উত্তর : (১) শক্তি (২) উপরে (৩) থার্মোমিটার (৪) উপরে (৫) নীচে (৬) ৬৮ ডিগ্রী। আমরা তাপ পাই (১) আগুন থেকে (২) একটা জিনিষের সঙ্গে অন্য কোন জিনিষ ঘষে (৩) সূর্য থেকে (৪) বিদ্যুৎ থেকে। আমাদের শরীর কতোখানি গরম বা হাওয়া কতোখানি গরম তা সঠিক ভাবে জানবার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়।

কাজ সহজ করা, পৃঃ 83—110

এই অংশটি কাজকর্মের নানান সমস্যা সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল আংশিকভাবে চরিতার্থ করবে।

(ক) কাজ সহজ করার জন্য কী কী যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?

(খ) যন্ত্রপাতি অথবা কলকব্জা কী ভাবে কাজ সহজ করে?

যদিও এখানকার ছবিগুলিতে সত্যিকার কাজ দেখানো হয়েছে তবুও ছেলেমেয়েদের খেলনাগুলোর মধ্যেই 'লিভার', চাকা, আনত তল, কপিকল ও অন্যান্য যন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

১০৮: (১) কপিকল (২) 'লিভার' (৩) আনত তল (৪) চাকা (৫) স্ক্রু (৬) গোঁজ।

১১০: প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য অধীত বিষয়গুলির পুনরালোচনা করা। ছেলেমেয়েদেরকে তাদের নিজেদের কথায় উত্তর দিতে বলুন।

পৃথিবীর গতি, পৃঃ 111—132

যারা ভূগোল পড়ান তাদের কাছে এই অংশের বিষয়গুলো সুপরিচিত। ছেলেমেয়েরা এই বিষয়গুলিতে বিশেষ কৌতূহলী হবে হয়তো—

(ক) দিন-রাত্রি কেন হয়?

(খ) রাত্রিবেলায় সূর্য কোথায় থাকে?

(গ) সময় কতো হয়েছে তা আমরা কী করে জানতে পারি?

(ঘ) পৃথিবী কী ভাবে ঘোরে?

ছেলেমেয়েরা উপরের এবং আরো অনেক প্রশ্ন করে। তাদের কোন কোন প্রশ্নের উত্তর সবচেয়ে বিদ্বান বৈজ্ঞানিকদের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ছেলেমেয়েদেরকে তারা নিজেরা ভেবে, কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবী, সূর্য ও তারা সম্বন্ধে যতোখানি সম্ভব জানতে দিন।

১১৯ - ১২০ : এই সরল পরীক্ষাগুলো ক্লাসের মধ্যেই চেষ্টা করা উচিত।

১২১ - ১২৩ : প্রাথমিক পর্যায়ের ছেলেমেয়ের লাঠির ছায়ার সাহায্যে সময় বলা শিখতে খুব মজা পাবে।

১২৪ : শীতের রাত্রে দক্ষিণের আকাশ।

১২৭ - ১২৮ : লাটিম অথবা বল ব্যবহার করে' পৃথিবীর দু'রকম গতি দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর গতি দেখাবার জন্য ছেলেমেয়েরা মাটি দিয়ে পৃথিবী ও সূর্যের মডেল তৈরী করতে বেশ মজা পাবে।

১২৯ -১৩১ : এখানকার "প্রশ্ন"গুলি এবং যা করতে হবে ও ভাবতে হবে আলোচনা ও প্রকৃত শিক্ষার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করবে। অল্প দাম দিয়েই খেলনা টেলীস্কোপ যোগাড় করা যায়।

১৩২ : সঠিক উত্তর : (১) পশ্চিম থেকে পূবে (২) সূর্য (৩) সাতবার (৪) এক-বছর (৫) চব্বিশ ঘন্টা।

উক্তি : (১) মিথ্যে (২) সত্যি (৩) সত্যি (৪) সত্যি

উদ্ভিদ কী করে জন্মায়, পৃঃ 133—156

বিজ্ঞানে অনেক রকম ধাঁধা আছে। যতীনের ধাঁধাটাও বেশ উপযুক্ত। ছেলেমেয়েরা অনেক সময় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে চায়: —

(ক) উদ্ভিদের বীজ হয় কেন?
(খ) বীজ বাড়ে কী করে?
(গ) কন্দ থেকে নতুন চারা হয় কী করে?
(ঘ) আর কী কী উপায়ে নতুন চারা জন্মানো যায়?
(ঙ) উদ্ভিদ কতোদিন বাঁচে?

১৩৮ – ১৩৯ : মূলোর বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। ক্লাসরুমে অতি সহজেই এগুলো অঙ্কুরিত করা যায়।

১৪০–১৪১ : ভুট্টার বীজ থেকে চারা। শিশুরা বীজ বুনলে তা থেকে কেমন করে চারা বেরোয় তা দেখতে ভালবাসে।

১৪৪–১৪৫ : পিঁয়াজ অথবা ফুলগাছের কন্দ ক্লাসের রুমেই মাটির টবে রেখে তা থেকে চারা গজানো যায়।

১৪৬–১৪৭ : টেলিফোন থামের গল্পটা কিন্তু সত্যি ঘটনা।

১৪৯ : সলোমনের মোহর।

১৫০ : রানার শুদ্ধু স্ট্রবেরীর চারা।

১৫১ : জিনিয়া, পেটুনিয়া, পপি, কস্‌মস্‌।

১৫২ : ফক্সগ্লাভ।

১৫৪–১৫৫ : বার্ষিক, দ্বিবার্ষিক ও বারমেসে ফুলের যে সমস্ত নমুনা এখানে দেখানো হয়েছে শিশুরা হয়তো সেগুলোর কোন কোনটা চিনতে পারবে।

যে কোন পাঠ্যপুস্তকের যে কোন অংশের মতো এই অংশটাও হয়তো সম্পূর্ণ নয়। এখানে বর্ণিত উদ্ভিদ ও বিষয়গুলো ছাড়া আরও অনেক রকম উদ্ভিদ ও বিষয়ের অবতারণা করে ছেলেমেয়েদের জানবার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে।

উপকারী উদ্ভিদ, পৃঃ 157—184

সহরের জনবহুল 'ফ্ল্যাট' বাড়ীগুলোতেও অনেক সময় কোন না কোন রকম উদ্ভিদ রাখা হয়। শিশুদেরকে উদ্ভিদ সংরক্ষণ সমন্ধে শিক্ষা দেবার সম্ভাবনাও এই অংশে পাওয়া যাবে। নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি আলোচ্য :-

(ক) উদ্ভিদ উপকারী কেন?

(খ) উদ্ভিদ আত্মরক্ষা করে কী করে।

(গ) আর কী কী করে উদ্ভিদদের যত্ন নেওয়া যায়?

(ঘ) গাছগাছড়া, বুনো ফুল ও অন্যান্য উপকারী উদ্ভিদগুলোকে আমরা কী ভাবে রক্ষা করতে পারি?

১৫৮–১৫৯ : সহরতলীতে একটি বাগান।
১৬০ : শুটী ও ভুট্টার অঙ্কুরিত বীজ।
১৬৭ : বাঁদিকে জই: ডানদিকে গম

১৬৮–১৬৯ : সমতলভূমির একটি দৃশ্য। কার্পাসের গুটী, ফুল ও পাতা শুদ্ধু কার্পাসের চারা।

১৭১–১৭২ : ম্যাপ্‌ল্ চিনি তৈরী করার জন্য ম্যাপ্‌ল্ গাছের রস সংগ্রহ।

১৭২ : দেবদারু, পাইন ও 'হেমলক'এর ডাল।

১৭৩ : উপর থেকে নীচে : জাপানী ঝিঁঝিঁপোকা, কার্পাসের পোকা, আলুর পোকা, ফড়িং।

১৭৭ : আরবুটাস, পদ্ম, মোকাসিন ফুল।

১৭৮ : লরেল, জেনটিয়ান, ডগউড।

১৭৯ : দুর্গন্ধ কপি (জলা যায়গায় দেখা যায়)।

১৮০ : বিষাক্ত আইভী লতা, বুনো গোলাপ।

১৮৪ : সঠিক উত্তর : (১) দুর্গন্ধ কপি, যব, ডগউড গাছ, পাট, বিষাক্ত আইভী, লেডী স্লিপার (২) তুলাবীজের তেল (৩) ম্যাপ্‌ল্ গাছ (৪) সারাবছরই যে গাছ সবুজ থাকে (৫) তুলা, পাট।

বিজ্ঞানের
বিচিত্র জগৎ